রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাদিগের হস্তেই রাজ্যের শাসন ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু সেই সকল বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, দুষ্ট কর্ম্মচারী সুযোগ পাইয়া রাজ্যের অর্থ লুট করিয়া লইতে লাগিল। রাজ্যে ঘোর দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতা উপস্থিত হইল। প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল।

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলি।

রাজা স্বয়ং রাজকার্য্য না দেখিলে, এবং বিদেশীয়-দিগের হস্তে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করিলে, সে রাজ্যের যে কি দুর্দ্দশা হয়, কবি তাহা অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা একটি স্থান হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"সুমিত্রা। জয়সেন ?
দেব। ব্যস্ত তিনি প্রজা সুশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্ন বস্ত্র আদি
সব গেছে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম্ম।
সুমিত্রা। শিলাদিত্য ?
দেব। তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজ স্কন্ধে করেন বহন।
সুমিত্রা। যুধাজিৎ ?
দেব। * * * *
আদরে বুলান্ হাত ধরণীর পিঠে ;
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।

যে সকল রাজপুরুষেরা এই বর্ণনা পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন, দর্পণে মুখ দেখার মত, এই বর্ণনার মধ্যে আপনাদের মুখচ্ছবি দেখিতে পাইতেন, দুঃখের বিষয় এই রচনা কোন দিনই তাঁহাদের চক্ষে পড়িবে না।

এ সকল অবান্তর কথা যা'ক্। আমরা বলিতেছিলাম, প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু কে তাহাদের হাহাকার শ্রবণ করিবে ? রাজা ত আর অন্তঃপুর হইতে বাহির হন না। অবশেষে প্রজাদের আর্ত্তনাদ রাণীর কর্ণে প্রবেশ করিল। রাণী ইহার প্রতীকার করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন।

রাজা সে কথায় কাণই দিলেন না। তখন রাণী স্বয়ংই ইহার প্রতীকারের অভিলাষে মন্ত্রীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী হয় ত পূর্ব্বে কখন অন্তঃপুরের বাহির হন নাই ; মন্ত্রীর সঙ্গে ত তাঁহার আলাপ পরিচয়ই ছিল না। তবুও কেমন নিঃসঙ্কোচে, সরল ও সুমিষ্ট ভাবে, অথচ ঠিক্ রাণীর মত বলিয়া উঠিলেন ;—

"আমি এ রাজ্যের রাণী—তুমি মন্ত্রী বুঝি ?"

মন্ত্রী সসম্ভ্রমে রাণীর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী বিদেশীয় অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারী-দিগকে ডাকাইয়া আনাইয়া শাস্তি দিতে চাহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন,—তাহারা রাণীর আদেশ মান্য করিবে না। তখন ঠিক হইল কালভৈরবের পূজোৎসবে সকল রাজ-কর্ম্মচারীকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। নিমন্ত্রণোপলক্ষে যখন তাহারা রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিবে, তখন তাহাদের বিচার হইবে।

বিদেশী রাজকর্ম্মচারীগণ রাণীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। তাহারা নিমন্ত্রণে অবহেলা করিল। রাজবাড়ীতে না আসিয়া বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইল। তেজস্বিনী রাণী এই বিদ্রোহের কথা শুনিয়া কুপিতা সর্পিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং রাজাকে কহিলেন,—

"বিদ্রোহ করিতে চাহে ! একি অহঙ্কার !
* * *
যাও অবিলম্বে, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেল চরণের তলে !"

রাজা কহিলেন, "সেনাপতি নিজেই যে শত্রুপক্ষে ; কিরূপে যুদ্ধ করিব ?" কিন্তু রাণী সুমিত্রা বাঙ্গালীর মেয়ে নহেন, বাঙ্গালীর স্ত্রীও নহেন ; যে ক্ষত্রিয় জাতিতে যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুমিত্রা সেই ক্ষত্রিয় বংশেই জন্মিয়াছেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"তুমি নিজে যুদ্ধে যাও।"

এই একটী কথায় কবি রাণীর হৃদয়কে কত মহৎ করিয়া তুলিয়াছেন। যে বিদ্রোহের মধ্যে অধিকাংশ

রাজকর্ম্মচারী রহিয়াছেন; যে বিদ্রোহে স্বয়ং সেনাপতি লিপ্ত হইয়াছেন; যে বিদ্রোহ দমন করিতে স্বয়ং রাজাই ভয় পাইতেছেন; একজন রমণীর মনে কতটা জোর থাকিলে, তিনি স্বামীকে সেই যুদ্ধে যাইতে অনুরোধ করিতে পারেন!

রাজা যুদ্ধে যাইতে অসম্মত হইলেন। সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতে চাহিলেন। অবশ্য রাজা যে যুদ্ধে যাইতে প্রাণের ভয় করিতেছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার ভিতরে যে কতটা শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তিনি জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"অপদার্থ আমি, অন্তঃপুরচারী!
কিন্তু মহারাণী, সে কি স্বভাব আমার?
* * রয়েছে দুর্জ্জয় শক্তি
এ হৃদয় মাঝে; প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে।"

এ কথা অতি সত্য। রাজার শক্তি থাকা সত্ত্বেও শুধু রাণীকে ছাড়িয়া যাইতে হয় বলিয়াই যুদ্ধে গেলেন না। কিন্তু তেজস্বিনী রাণী ক্ষোভে মনস্তাপে বলিয়া উঠিলেন;—

"ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রাণী?"

অনেক দিন পূর্ব্বে "মেঘনাদবধ" কাব্যে প্রমীলার মনের তেজ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, তার পর এই "রাজা ও রাণী" নাটকে সুমিত্রার চরিত্রের তেজ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি।

অতঃপর রাণী এই বিদ্রোহ দমনের জন্য মনে মনে এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার ভাই কুমার সেন যেমনই তেজস্বী বীর, তেমনই তাঁহার মহৎ হৃদয়। সুমিত্রার উপর তাঁহার স্নেহও অত্যন্ত অধিক। কুমার সেনকে রাজার এই বিপদের কথা বলিলে, তিনি যে ভগিনীর বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া মনে করিবেন এবং ভগিনীর প্রতি মমতা বশতঃ জালন্ধর রাজ্যের বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। সেই জন্য রাণী পুরুষের ছদ্মবেশে গৃহের বাহির হইলেন এবং পিতৃরাজ্য কাশ্মীরে গমন করিলেন। কাশ্মীরে গিয়া ভাইকে নিজের বিপদের কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। কুমার সেনের ত ইচ্ছা সত্বরই সৈন্য লইয়া ভগিনীপতির রাজ্যে গমন করেন ও তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু কুমার সেন নিজে রাজা নহেন। তাঁহার পিতৃব্য চন্দ্রসেনই তখন কাশ্মীরের সিংহাসনে উপবিষ্ট। চন্দ্রসেনের পত্নী অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণা ক্রূর প্রকৃতির স্ত্রীলোক। কুমার সেন তাঁহার দুই চক্ষের বিষ। সেই জন্য তিনি দুর্ব্বলচরিত্র স্বামীকে কুটিল বুদ্ধিতে বশ করিয়া, কুমার সেনকে তাঁহার পিতৃসিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার ফিকির করিতেছিলেন।

যা হো'ক, কুমার সেনের পিতৃব্য কুমার সেন ও তাহার সৈন্যদিগকে জালন্ধরে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। তখন কুমার সেন সুমিত্রাকে কহিলেন, "বোন, চল মোরা যাই দোঁহে,—পড়ি গিয়া রাজার চরণে!"

তেজস্বিনী সুমিত্রার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানে আঘাত লাগিল। তিনি ভাইকে কহিলেন,

"এসেছি তোমার কাছে, জানাতে তোমারে
ভগ্নীর হৃদয় ব্যথা। আমি কি এসেছি
জালন্ধর রাজ্য হতে ভিখারিণী রাণী
ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে?
* * * *
শুধু আমি নহি আর কন্যা কাশ্মীরের,
আজ আমি জালন্ধর-রাণী।"

কিন্তু কুমার সেনের পিতৃব্যপত্নী পিতৃব্যকে বেশ এক মন্ত্রণা দিলেন। কহিলেন "মহারাজ, কুমার সেনকে কেন যুদ্ধে পাঠাও না? সে যুদ্ধে ত যা'ক। তার পর দেবতার কৃপায় আর যদি ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলেই আপদ চুকিয়া গেল।"

পিতৃব্য তাঁহার পত্নীর এই কুমন্ত্রণায় কুমার সেনকে জালন্ধর পাঠাইলেন। কিন্তু সুমিত্রার পলায়নের পর জালন্ধরের রাজা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—

"তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম্ম মোর,
রাজধর্ম্ম ফিরে দাও; পুরুষ হৃদয়

মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গ মাঝে!
কোথা কর্ম্মক্ষেত্র! কোথা জনস্রোত! কোথা
জীবন মরণ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস?—"

রাজা এই প্রার্থনার পর বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুদ্ধে বিদ্রোহীগণ পরাস্ত হইল। তাহাদের কয়েকজন দলপতি ধরা পড়িল; অন্য কয়েকজন দলপতি সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল। এদিকে কুমার সেন পলাতকদিগকে সম্মুখে পাইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। রাণী সুমিত্রা সেই বন্দীদিগকে লইয়া রাজার শিবিরে চলিলেন। কিন্তু রাজা আর রাণীকে শিবিরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। এইবার রাণীর হৃদয়ের তেজ ম্লান হইয়া পড়িল। রাণী যখন রাজার শিবিরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন, সেনাপতি তাহাকে বাধা দিলেন; তখন রাণী কহিলেন,—

"ভৃত্য! সরে যাও—খুলে দাও দ্বার।"

সেনাপতি কহিল,—

———"আমি শুধু অচেতন
লৌহের অর্গল, মহারাজ নিজ হস্তে
দিয়েছেন আঁটি শিবির-দুয়ারে!"

হায়, সেই নারীমহিমায় মণ্ডিতা তেজস্বিনী সম্রাজ্ঞীর তৎকালের অবস্থা দেখিয়া কে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে? রাণী কাতর হইয়া সেনাপতিকে কহিলেন,—

———"তবে
নিয়ে যাও বন্দী করে মোরে দীন হীন
অপরাধী সম। আমি রাণী নহি। আমি
ক্ষুদ্র দোষী প্রজা। নিয়ে যাও রাজেন্দ্রের
বিচার আসন-তলে।"

যে মহিমাময়ী রাজমহিষী একদিন রাজকার্য্য হস্তে গ্রহণ করিয়া, বিদ্রোহী কর্ম্মচারীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য নির্ভীক চিত্তে মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছিলেন, আজ সেই রাজ্ঞী পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া আপনাকে কি দুঃখিনী এবং অপরাধিনীই মনে করিতে লাগিলেন। "রাজা ও রাণীর" এক একটী স্থান এইরূপ করুণ রসে এমন মর্ম্মস্পর্শী, পড়িতে পড়িতে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্মদর্শী, বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়-তন্ত্রীতে কিরূপে আঘাত করিতে হয়, তাহা তিনি অতি উত্তম রূপেই অবগত আছেন। সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থখানির অধিকাংশ স্থানের বর্ণনাই চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থের কোন্ কথাটি রাখিয়া যে কোন্ কথাটি উদ্ধৃত করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারি না।

রাণী ত রাজার শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কুমার সেন রাজার জন্য যুদ্ধ করিলেন, বিদ্রোহীদিগকে বন্দী করিয়া আনিলেন, রাজা তাহার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিলেন না; বরং উল্টা সেই উপকারী আত্মীয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। কারণ, বন্দী বিদ্রোহীগণ রাজাকে কহিল,—"মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা, অপরাধ করে' থাকি, তুমি শাস্তি দেবে। তোমার বিনানুমতিতে একজন বিদেশী এসে গায়ে পড়ে' আমাদের অপমান করবে, এতে তোমাকেই অপমান করা হ'ল—যেন তোমার নিজরাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই।"

রাজা এই সকল কুমন্ত্রণায় যে ভুলিবেন, তেমন নির্ব্বোধ তিনি নহেন। তবে,—

"ভাঙ্গিয়াছে বাঁধ, এখন প্রবল স্রোত
শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেক করে
ফিরে যাবে তোমাদের আবশ্যক বুঝে?
* * * চূর্ণিবে সে
লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশ গ্রাম।"

রাজার অন্তরের যুদ্ধস্পৃহা এখন বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার জলের মত ছুটিয়াছে; সে কি আর ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে? রাজা উন্মাদকর অন্ধ আবেগে উন্মত্ত হইয়া কুমার সেনকে তাঁহার কার্য্যের জন্য ভৎর্সনা করিলেন। তারপর তাঁহার সঙ্গেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কুমার সেন বীরপুরুষ, তিনি কি কখনও যুদ্ধের নামে ভয় পান? তিনি ইচ্ছা করিলে রাজাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিতেন। কিন্তু ভগিনী সুমিত্রার প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ! সুমিত্রা যখন কহিলেন,—

"ভাই, রাজারে মার্জ্জনা কর ; কর রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে
যুদ্ধ করে' বীর নাম করিতে উদ্ধার।"

তখন আর তাঁহার যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল না। এই স্থানে কবি কুমার সেনের মুখ দিয়া যে কয়েকটী কথা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে কবির অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। অতি অল্প কয়েকটী কথায় শক্তিশালী কবি কুমার সেনের মহৎ হৃদয়কে অতি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে কুমার সেনের চিত্র মহত্ত্বের উজ্জ্বল রশ্মিতে আলোকিত। সুবিধা হইলে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে এই মহচ্চরিত্রের আলোচনা করিব।

কুমার সেন ভগিনীর মঙ্গলের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া সৈন্যসহ কাশ্মীরে ফিরিয়া চলিলেন। তিনি বলিলেন,—

"জানিস্‌নে, বোন,
যুদ্ধ বীরধর্ম্ম নহে সকল সময়।
উচিত মুহূর্ত্তে যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত থাকা
অধিক বীরত্ব। হিংসা-ক্ষিপ্র তরবারি
শত্রুর হৃদয়ে হানা নহে ত কঠিন
কাজ ;—বীর্য্য চাই কোষ মধ্যে রুদ্ধ করে'
রাখিবারে তারে। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া ?"

কুমার সেন শুধুই ত বীর নহেন ; তিনি জ্ঞানী, তিনি ধার্ম্মিক। তাই সুমিত্রা তাঁহার মহৎবাক্যে বিস্মিত হইয়া ভক্তি-বিগলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"ধন্য, ভাই,
ধন্য তুমি ! সঁপিলাম এ জীবন মোর
তোমার লাগিয়া ! তোমার এ স্নেহ ঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ ?
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নর সমাজ মাঝে—"

ইহার পর দুই ভাই ভগিনীর মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, তাহা প্রীতির অমৃতরসে সুমধুর, তাহা ভাষার মাধুর্য্যে মনোমুগ্ধকর ; তাহা কাব্যসৌন্দর্য্যে অতি উপাদেয় বস্তু। বলিতে কি, ভাই ভগিনীর ভালবাসার এমন মনোহর চিত্র, এরূপ অনুপম বর্ণনা, এক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "হিমাদ্রি কুসুম" ব্যতীত আর কোন বাঙ্গলা কাব্য পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সুমিত্রার হৃদয়ের প্রীতির প্রসার যে সুদূরব্যাপী, এস্থানে কবি তাহাও অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সুমিত্রার অন্তরের সুগভীর প্রীতি শুধুই ত স্বামীর হৃদয়ের সীমানার মধ্যে রুদ্ধ হইয়া পড়ে নাই ; তাহা বর্ষাকালের স্রোতস্বিনীর ন্যায় স্বামীর হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া, রাজ্যের প্রজাদিগকে করুণা দান করিয়া, ভ্রাতার চিত্তকেও সুধারসে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সুমিত্রা যথার্থই প্রেমময়ী মনস্বিনী নারী।

কিন্তু সে কথা যা'ক। আমরা আখ্যায়িকা বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া সুমিত্রার মহত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅ—

ভূগর্ভের অবস্থা।

ভূগর্ভের অবস্থাটা বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুকাল হইতে নানা দেশের পণ্ডিত এসম্বন্ধে নানা গবেষণা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কেহই কোন এক নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কোটি কোটি ক্রোশ দূরবর্ত্তী নক্ষত্রগুলি কি কি উপাদানে গঠিত এবং তাহাদের অবস্থাই বা কি, বিজ্ঞানের প্রসাদে একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রদ্বারা আমরা তাহা অনায়াসে জানিতে পারিতেছি ; তা' ছাড়া ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক ধূলিকণার গঠনোপাদানও জানিবার উপায় আমাদের করায়ত্ত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু ধরাপৃষ্ঠের কয়েক মাইল নিম্নে কি কি জিনিস আছে, এবং তাহার অবস্থাই বা কি, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গেছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অতি দূর অতীতে আমাদের পৃথিবীটা জ্বলন্ত বাষ্পাকারে ছিল। তা'র পর তাপ ছাড়িয়া ছাড়িয়া সেই বাষ্পরাশিই ক্রমে জমাট

বাঁধিয়া আধুনিক কঠিন ভূপৃষ্ঠের গঠন করিয়াছে। ইহাঁরা আরো বলেন, ভূপৃষ্ঠ শীতল হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু ভূগর্ভ আজও খুব গরম আছে। পৃথিবী এই ভূগর্ভের তাপ আজও ছাড়িতেছে।

বলা বাহুল্য বাষ্পাবস্থা হইতে জমাট বাঁধিয়া যে ভূপৃষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখান এখন অসম্ভব। দূরবীন্ দিয়া আকাশের নানা অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, কোটি কোটি মাইল স্থান জুড়িয়া বাষ্পময় পদার্থকে স্থানে স্থানে জ্বলিতে দেখা যায়। জ্যোতিষিগণ বলেন, এই বিশাল জ্বলন্ত বাষ্পরাশি এককালে শীতল হইয়া আমাদের সৌরজগতের ন্যায় এক একটা নূতন জগতের রচনা করিবে। কতকটা শীতল হইয়া জমাট বাঁধিবার উপক্রম করিতেছে, এ প্রকারও উজ্জ্বল বাষ্প-রাশি আকাশে দেখা গিয়াছে। সুতরাং আমাদের সৌর জগতটা যে এক কালে ঐ প্রকার অবস্থায় ছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জ্যোতিষের কথা ছাড়িয়া দিয়া পৃথিবীর আকারের বিষয়টা লইয়া ভাবিলে, উহার পূর্ব্বাবস্থার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কাদার ন্যায় কোন জিনিস দিয়া গোলক নির্ম্মাণ করিয়া, সেটিকে ক্রমাগত লাটিমের মত ঘুরাইতে থাকিলে, গোলকের কোমল উপা-দান তাহার মাঝামাঝি স্থানে জড় হইয়া পড়ে। আমাদের পৃথিবীর বিষুব প্রদেশ মেরু প্রদেশের তুলনায় সেই প্রকার কিছু উন্নত অবস্থায় আছে। ইহা দেখিয়া প্রাচীন আধুনিক অনেক বৈজ্ঞানিকই বলিয়া আসিতেছেন, পৃথিবীর উপাদান এককালে কাদার মত কোমল ছিল, এবং ধরার আহ্নিক গতিতে মেরু প্রদেশের উপাদান, সেই সময়ে বিষুব প্রদেশে জমা হইয়া পড়ায়, পৃথিবীর এই ঈষৎ চেপ্‌টা আকার হইয়াছে।

পৃথিবীর আদিম অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণটি সুন্দর হইলেও, এটিকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় আছে। কেহ কেহ বলেন, যে প্রকারে ঘুরাইলে কর্দ্দমপিণ্ড ধরার অনুরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, আমাদের পৃথিবীটি অতি প্রাচীনকালে প্রকৃতই সেই প্রকারে ঘুরিয়াছিল কি না, তাহার মীমাংসা হয় নাই। কাজেই প্রমাণ প্রদর্শন সুন্দর হইলেও মূল ব্যাপারটিতে ঘোর সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে।

আদিম অবস্থা যাহাই থাকুক, পৃথিবী যে অদ্যাপি গরম আছে এবং ভূগর্ভ হইতে যে আজও তাপ বাহির হইতেছে, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। ভূগর্ভে গর্ত্ত করিয়া দেখা গিয়াছে, গভীরতা বৃদ্ধির সহিত ভিতরকার উত্তাপের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া যায়। সুতরাং ভূগর্ভ হইতে ক্রমাগত তাপ বাহির করিয়া যে পৃথিবী শীতল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গভীরতা বৃদ্ধির সহিত ভূগর্ভের উষ্ণতা কি মাত্রায় বাড়িয়া থাকে তাহা হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রতি ৫১ ফিট্ গভীরতায় উষ্ণতা এক ডিগ্রি করিয়া বাড়িয়া চলে। কাজেই এই হিসাবে ভূপৃষ্ঠের দুই মাইল নীচেকার উষ্ণতায় জল বাষ্প হইবার কথা এবং পঞ্চাশ মাইলের উষ্ণতা আজকালকার বৈদ্যুতিক চুল্লীর উষ্ণতা অপেক্ষা অনেক অধিক হইবার সম্ভাবনা। ভূপৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্র প্রায় চারি হাজার মাইল নীচে অবস্থিত, সুতরাং ঐ হিসাবে ভূকেন্দ্রের উষ্ণতা যে কত অধিক, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

এই প্রকার ভয়ানক উত্তাপে ভূগর্ভের গভীর প্রদেশের পদার্থ সকল কি প্রকার অবস্থায় আছে, তাহা স্থির করিবার জন্য, এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গেছে। সাধারণ বায়ুর চাপে একশত ডিগ্রিতে জল ফুটিতে আরম্ভ করে, কিন্তু তাহার উপরকার চাপ বাড়াইতে থাকিলে, পূর্ব্বেকার উষ্ণতায় জল কোন ক্রমেই ফুটিবে না। তখন অধিক তাপের আবশ্যক হইবে। চাপের পরিমাণ কোন প্রকারে কম করিয়া দাও, অল্প তাপ লাগিবে। এই জন্য উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে অতি অল্প তাপেই জল ফুটিতে আরম্ভ করে, এবং কোন স্থান হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া সেখানে জল গরম করিতে থাকিলে, অতি অল্প তাপেই জলকে ফুটিতে দেখা যায়। কেবল জল বলিয়া নয়, পদার্থ মাত্রেরই ফুটার ব্যাপারে চাপের এই কার্য্য সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কঠিন ধাতুকে সাধারণতঃ বাষ্প করিতে

যে তাপের আবশ্যকতা হয়, তাহার উপরকার চাপ বাড়াইলে অধিক তাপের দরকার হইয়া পড়ে। দ্রব হওয়ার সহিত চাপের এই সম্বন্ধ দেখিয়া, এক দল পণ্ডিত বলেন,—ভূগর্ভের তাপ খুব অধিক বটে, এবং ঐ তাপে মাটি, পাথর, ধাতু, অধাতু সকল জিনিসই যে গলিয়া যাইতে পারে, তাহাও ঠিক্। কিন্তু পৃথিবীর গভীরস্তরস্থ পদার্থের উপর উপরের স্তর গুলি যে চাপ দিতেছে, তাহা হিসাব করিলে ভূগর্ভের উত্তাপে কোন জিনিসের দ্রব না হইবারই কথা। ইহাঁদের মতে পৃথিবীর অভ্যন্তরটা এত উত্তাপ সত্ত্বেও আমাদের ভূপৃষ্ঠেরই মত কঠিন অবস্থায় আছে। আগ্নেয়গিরি হইতে অনেক সময় দ্রব মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি নির্গত হয়। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তিগণ বলেন,—আগ্নেয়গিরির মুখবিবর ও ভূগর্ভের অত্যুষ্ণ গভীর স্তর-গুলি সুড়ঙ্গাকার পথ দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এ অবস্থায় স্তরগুলির উপর সাধারণ বায়ুর চাপ ব্যতীত অপর কোনও চাপ থাকে না। কাজেই ভূগর্ভের তাপে তখন মৃত্তিকা প্রস্তরাদি দ্রব ও বাষ্পীভূত হইয়া বাহির হইতে আরম্ভ করে।

চাপ অধিক দিলে বস্তু মাত্রকেই গালাইতে যে অধিক তাপের আবশ্যক হয়, নানা পরীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হইয়া গেছে, এবং ভূগর্ভের গভীর স্থান গুলি যে প্রকাণ্ড চাপের তলে আছে, তাহাও আমরা সহজ বুদ্ধিতে বেশ বুঝিতে পারি। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত মতবাদটি প্রচারিত হইলে, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাধারণের বিশেষ সন্দেহ হয় নাই। সকলে ভাবিলেন, বহুকাল পরে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাটা বুঝি নির্ভুল রূপে জানা গেল। কিন্তু এই বিশ্বাস অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। সিদ্ধান্তটিকে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক বলিতে লাগিলেন, গভীরতা অনুসারে চাপ ও তাপ উভয়ই বাড়িতে থাকে সত্য, কিন্তু ভূগর্ভের অগভীর স্থানের তাপ, চাপের তুলনায় অধিক হওয়া কোন ক্রমেই অসম্ভব নয়। এ প্রকার স্থলে, ভূগর্ভের তাপে মৃত্তিকা প্রস্তরাদি দ্রব হইয়া থাকাই সম্ভাব। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহাঁরা গণনা করিয়া স্থির করিলেন, ভূপৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত চারি হাজার মাইল স্থানে, তিনটি প্রধান স্তর আছে। এর প্রথম স্তরটি আমাদের ভূপৃষ্ঠ; ইহার গভীরতা প্রায় ১০০ মাইল। এই স্তরের চাপ ও তাপ উভয়ই অল্প হওয়ায়, তন্মধ্যস্থ পদার্থ মাত্রই কঠিন অবস্থায় আছে। তার পরবর্ত্তী স্তরটি চারিশত মাইল গভীর এবং অত্যুষ্ণ দ্রবপদার্থময়। ইহার উষ্ণতা উপরকার একশত মাইল স্তরের চাপের তুলনায় অত্যন্ত অধিক; তাই সেই চাপে পড়িয়াও ঐ স্তরের মৃত্তিকা প্রস্তরাদি না গলিয়া থাকিতে পারে না। কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী সর্ব্ব নিম্ন স্তরটির গভীরতা ৩৫০০ হাজার মাইল। ইহাতে চাপ ও তাপ উভয়েরই খুব বাড়াবাড়ি। কাজেই এই স্তরটি ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন স্তরের ন্যায় কঠিন অবস্থাতেই আছে।

ভূগর্ভের অবস্থা সম্বন্ধীয় এই মতবাদটি বৈজ্ঞানিক সমাজে এককালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সম্প্রতি ইহারও গলদ ধরা পড়িয়াছে। পৃথিবীর উপর চন্দ্র সূর্য্যের প্রভাব বড় অল্প নয়। সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটায় এই প্রভাব বিলক্ষণ বুঝা যায়। ইহা দেখিয়া আপত্তি উঠিয়াছে, একশত মাইল কঠিন স্তরের নীচে যদি প্রকৃতই চারিশত মাইল গভীর দ্রবপদার্থ থাকিত, তবে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে, তাহাতে নিশ্চয়ই জোয়ার ভাঁটা উৎপন্ন হইত, এবং আমরা ভূপৃষ্ঠে থাকিয়া তাহার ফল অনুভব করিতে পারিতাম।

কোন নূতন মতবাদ প্রচারিত হইলে, অনেক সময়ে তাহার বিরুদ্ধে নানা অমূলক কথা শুনা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তর্কটি সে প্রকার নয়। হিসাবে দেখা গেল পৃথিবীর উপরকার কঠিনাংশের গভীরতা অন্ততঃ দুই হাজার মাইল না হইলে ভূপৃষ্ঠ কখনই এখনকার মত অচঞ্চল অবস্থায় থাকিতে পারিত না। লর্ড কেল্‌ভিন্ (Kelvin) এই ব্যাপারটি লইয়া কিছুকাল আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, বহুদিন পূর্ব্বে ভূপঞ্জরে, দুই কঠিন স্তরের মধ্যে, একটি দ্রবপদার্থের স্তর ছিল, কিন্তু এখন আর পৃথিবীর সে অবস্থা নাই। আজ কাল ইহার অভ্যন্তরে দুই এক স্থানে দ্রবপদার্থ আছে, তা ছাড়া সকলই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লর্ড কেলভিন্ আজকাল বৈজ্ঞানিকদিগের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সুতরাং ভূগর্ভের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কেহই দাঁড়াইতে সাহস করেন নাই। এখন অধ্যাপক ফিসার নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে যে নূতন কথা বলিতেছেন, তাহাতে কেলভিনের সিদ্ধান্তের উপর ঘোর সন্দেহ আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ভূগর্ভে দ্রবপদার্থময় স্তর থাকিলে, তাহাতে চন্দ্রের আকর্ষণে যে জোয়ার ভাঁটা হইত, তাহার লক্ষণ আমরা ভূপৃষ্ঠে থাকিয়া স্পষ্ট জানিতে পারিতাম, এই মনে করিয়া লর্ড কেলভিন্ দ্রবস্তরের অস্তিত্বের কথা একবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। ফিসার সাহেব বলিতেছেন, ভিতরকার জোয়ার ভাঁটার লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় না বলিয়াই, ভূগর্ভে দ্রব জিনিস নাই এ প্রকার সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় নাই। দ্রব বস্তুর সহিত বায়বীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে, প্রবল আকর্ষণেও তাহাতে জোয়ার ভাঁটা হয় না। সম্ভবতঃ পৃথিবীর দ্রবস্তরে প্রচুর হাইড্রোজেন বাষ্প মিশ্রিত আছে, তাই তাহার জোয়ার ভাঁটার চিহ্ন আমরা ভূপৃষ্ঠে থাকিয়া দেখিতে পাই না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূগর্ভ হইতে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন বাষ্প বহির্গত হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া আজ কাল অনেকে ফিসার সাহেবের অনুমানটির সমর্থন করিতেছেন।

বলা বাহুল্য পৃথিবীর আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্বন্ধে এতগুলি কথার মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা এখনও ঠিক বলা যাইতেছে না। প্রথম হইতেই যে ব্যাপারের মূলে এত মতদ্বৈধ, এক ফিসার সাহেবের কথাতেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে না। শত বৎসর পূর্ব্বে বিষয়টি যেমন রহস্যময় ছিল, আজও বোধ হয় সেটি অবিকল সেই প্রকারেই রহিয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বদেশী আন্দোলন—বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারের সমকালে স্বদেশী আন্দোলনের যেরূপ উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল, এখন সেই উচ্ছ্বাসের তেমন প্রবলতা আর দেখা যায় না। অনেকে সেই সময়ে মনে করিয়াছিলেন, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ-আন্দোলনের তীব্রতা কমিয়া গেলেই স্বদেশী আন্দোলনও থামিয়া যাইবে; কারণ প্রবল উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মানুষ অনেক ত্যাগস্বীকারের কথা বলে, কিন্তু কঠোর জীবন সংগ্রামে সেই সকল প্রতিজ্ঞা পালন করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু দেশের লোক যদি দেশকে সত্যই ভালবাসিতে শিখে, তবে দেশের কল্যাণের জন্য অনেক অসুবিধা সহিতে পারে। সুখের বিষয়, এখন এদেশের বহু লোক মাতৃভূমিকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং ধীর গতিতে স্বদেশী বস্তুর প্রচার বৃদ্ধি পাইতেছে। বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া দেশের শিল্পীগণ প্রবল উৎসাহে স্বদেশী জিনিষ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং ক্রমেই উৎকৃষ্টতর বস্তু নির্ম্মিত হইতেছে। এখন দৃঢ়তার সহিত আমাদিগকে স্বদেশী বস্তু ব্যবহার বিষয়ক সংকল্প রক্ষা করিতে হইবে এবং যাহারা সংকল্প পালনে শিথিলতা প্রকাশ করিতেছে, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। পতিত জাতির উত্থান অতি কঠিন ব্যাপার। এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের উত্থানাকাঙ্ক্ষার সবলতার পরীক্ষা হইবে।

পূর্ব্ব বঙ্গে অত্যাচার—রাজকীয় অত্যাচার পতিত জাতির উত্থানের এক উৎকৃষ্ট সহায়। ইংরেজ সুসভ্য রাজা, তাঁহারা আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন, সেই সকল উপকারের জন্য আমরা ইংরেজ রাজের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু ইংরেজ দিন দিন মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, আপন স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহারা সত্য ও ন্যায়কে পদদলিত করিতেছেন। ভারতবাসীর উত্থানে তাঁহাদের সমূহ স্বার্থনাশ, সুতরাং এই উত্থান-চেষ্টায় বাধা দেওয়া তাঁহাদের

নিতান্ত প্রয়োজন। লর্ড কার্জ্জন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি নানা আবরণে রাজকীয় নীচতা আচ্ছাদন করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা ফুলার সাহেব সেই স্বচ্ছ আবরণটুকুও দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। তিনি নিতান্ত প্রকাশ্য ভাবেই বাঙ্গালীর উত্থান-চেষ্টায় বাধা দিতেছেন। সে দিন বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির প্রতিনিধিদিগের প্রতি পুলিসের অত্যাচার, দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থ দণ্ড ও প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন ভঙ্গ প্রভৃতি কার্য্যে ইংরেজ শাসনে গুরুতর কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী জাতির ইহাতে পরম উপকার হইতেছে, অন্যায় অত্যাচারে বাঙ্গালী আপনার প্রকৃত দুর্দ্দশার পরিমাণ বুঝিতে পারিতেছে। এই সকল অত্যাচারে স্বদেশী আন্দোলন প্রচুর বল লাভ করিতেছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এই অত্যাচার দেশের পক্ষে আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে জাপানপ্রত্যাগত রমাকান্ত রায় মাহাশয় গত ২৭এ বৈশাখ জ্বরবিকার রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে ইনিই সর্ব্বপ্রথম জাপান গমন করেন। তখন জাপান সভ্য জগতে এতটা পরিচিত ছিল না, বিদেশগমনপরাঙ্মুখ বাঙ্গালীর পক্ষে জাপান গমন অদ্ভুত সাহসের কর্ম্ম ছিল। সকল বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া রমাকান্ত রায় জাপান গমন করতঃ বাঙ্গালীর উন্নতির একটা অতি উৎকৃষ্ট পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে রমাকান্ত দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি আড়াই শত টাকা বেতনে কাশ্মীর রাজ্যে খনির ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, দেশের সেবায় ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তিনি সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি পুনরায় আড়াই শত টাকা বেতনে রাণীগঞ্জে একটী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আড়াই শত টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা মাত্র নিজের ব্যয়ের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ২০০৲ টাকা চারি জন বাঙ্গালী যুবককে আমেরিকায় বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যার্থ প্রদান করিবেন, এরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই জন্য তিনি চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ চারি জন যুবক আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রমাকান্ত রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। এমন স্বদেশ-প্রেমিক যুবক দেশের অলঙ্কারস্বরূপ।

রমাকান্তের চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। তাহাতে কৃত্রিমতা ও অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। এই অল্প বয়সেই তিনি দৃঢ় ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। রমাকান্তের মত সরল সাধুপ্রকৃতি যুবক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আমাদের বিশেষ বন্ধু ও "ভারত-মহিলার" পরম হিতৈষী ছিলেন। "ভারত-মহিলার" প্রথম সংখ্যায় তাঁহার একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই "ভারত মহিলায়" জাপানী নারীগণের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে দিবানিশি ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া ইদানীং লিখিবার অবসর পাইতেন না। উল্লিখিত প্রবন্ধে তিনি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের নিকট জাপানী মহিলা সুবিখ্যাত হিরাওকার জীবনচরিত লিখিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু লেখা আর হইল না। ৩৩ বৎসর বয়সে রমাকান্ত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণকে শোকগ্রস্ত করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। একটী সান্ত্বনার বিষয় এই, যে তাঁহার পিতামাতা জীবিত নাই এবং তিনি বিবাহ করেন নাই।

অমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

IMPERIAL 280

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ।

AK3 171 2
2
281
3-1906

ভারতী-মাহিলা

25 JUL 1906

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

১ম ভাগ। | আষাঢ়, ১৩১৩। | ১১শ সংখ্যা।

গৃহধর্ম্ম ও সামাজিক নীতি।

মানুষে মানুষে যেখানে সম্বন্ধ সেইখানেই নীতির প্রসঙ্গ। যে ব্যক্তি চিরজীবন নির্জ্জন অরণ্যে বা গিরিকন্দরে বাস করিতেছে তাহার পক্ষে নীতির প্রসঙ্গই নাই। অরণ্যে ইতর প্রাণীদিগেরও প্রতি তাহার কিছু কর্ত্তব্য আছে, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে তাহার যে ব্যবহার তাহাও উন্নত নীতির অন্তর্গত। তবে যে তাহার পক্ষে নীতির প্রসঙ্গ নাই বলিয়াছি, তাহা নীতির সামাজিক অর্থে। সাধারণ লোকের বিচারে সামাজিকতা ও নীতি অভিন্ন ভাবে জড়িত।

মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বসিবামাত্র নীতির নিয়মগুলি স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়াছে। এবং এ কথা স্বীকার করা যায়, যে নীতির মূল নিয়মগুলি প্রায় সর্ব্বসমাজেই বহুকাল পূর্ব্বে ফুটিয়াছে। অর্থাৎ মিথ্যা অপেক্ষা সত্য ভাল, পরস্ব হরণ ভাল নয়, পরস্ত্রী হরণ ভাল নয়, আদানপ্রদানে অন্যায় অপেক্ষা ন্যায় ভাল, স্বার্থপরতা অপেক্ষা নিঃস্বার্থতা ভাল, এ সকল তত্ত্ব কোনও সমাজেই ফুটিতে বাকি নাই।

ক্ষতিলাভ গণনা করিয়া অথবা সুখ দুঃখের পরিমাণের হিসাব করিয়া এসকল নিয়ম স্থাপিত হয় নাই। যেমন বৃক্ষটী মাটী ফুঁড়িয়া উঠিবে, শাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইবে, পুষ্প ফল ধারণ করিবে, এই জন্য বিধাতা তাহার অভ্যন্তরে এমন সকল ধাতু ও এমন সকল শক্তি দিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি সম্ভব হয়, তেমনি তিনি মানবকে সামাজিক জীব করিবার সময় তাহার প্রকৃতিতে এমন স্বাভাবিক বৃত্তি সকল স্থাপন করিয়াছেন, যদ্দ্বারা সমাজের উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি সম্ভব হয়। এইগুলিকে আমরা নীতির নিয়ম বলিয়া থাকি। বৃক্ষটী উঠিয়া দাঁড়াইলে বায়ু উত্তাপ প্রভৃতির সংশ্রবে যেমন তাহার ভিতরকার শক্তি ফুটে, তেমনি মানবের সামাজিকতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীতির নিয়মগুলি ফুটিয়াছে, এই মাত্র। সেগুলি মানবের স্বভাব-নিহিত, সুতরাং অধিকাংশের সুখ দুঃখ গণনা করিয়া যে নীতির নিয়ম স্থাপনের চেষ্টা, তাহা প্রকৃত পথ নহে।

গৃহ পরিবার দিয়া সামাজিকতার আরম্ভ। মিছরির

দানা বাঁধার ন্যায় দাম্পত্য প্রেম দুই মানবাণুকে এক করে, তৎপরে দুই চারি হয়, চারি আট হয়, আট ষোল হয়, এইরূপে সমাজের সৃষ্টি।

এই জন্য গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিলেই মানুষ সমাজের সঙ্গে বাঁধা পড়ে; সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে ব্যক্তি ভবঘুরে, যে সর্ব্বপ্রকার বন্ধনবিহীন হইয়া হোটেলে হোটেলে খাইয়া জগত প্রদক্ষিণ করিতেছে, সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অল্প; কিন্তু যে ভাল বাসিয়া কোনও নারীর হাত ধরিয়া বলিতেছে, "এস দুজনে একস্থানে বসি", পাখীর কুলায়ের ন্যায় তার একটী গৃহ চাই, যেখানে শিশুগুলি প্রতিপালিত হইতে পারে; তাহার একটী সমাজ চাই, যেখানে রোগে, শোকে, বিপদে সাহায্য পাইতে পারে। সমাজে আদানপ্রদানের নিয়ম; তুমি যদি কিছু চাও তোমাকে কিছু দিতে হইবে; সুতরাং বিবাহিত দম্পতীর পক্ষে সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি উদাসীন হওয়া পোষায় না।

সুতরাং যে যে নীতির নিয়মের উপরে সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করে, তাহার সহিত প্রত্যেক গৃহস্থকেই যোগ রাখিতে হয়; এবং যে সকল দুরাচারের গতি সমাজকে ভাঙ্গিবার বা অসুখী করিবার দিকে, সে সকল দুরাচারকে সকল গৃহস্থই ঘৃণা করিয়া থাকে।

আর এক কারণে সামাজিক নীতির সহিত গৃহধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নীতির নিয়মগুলি সর্ব্বসমাজেই বিদিত বটে, কিন্তু সেগুলির প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপিত হওয়া অথবা সেগুলি প্রবল শক্তিরূপে মানব চরিত্রের অঙ্গীভূত হওয়া শিক্ষা-সাপেক্ষ। যে সমাজে এইগুলি বহুসংখ্যক নরনারীর হৃদয়ে প্রবল কার্য্যকারিণী শক্তিরূপে বাস করে, এবং পুণ্যে রতি ও পাপে বিরতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, সেই সমাজই সুখী ও উন্নত হয়; কিন্তু নীতির নিয়মকে কার্য্যকারিণী শক্তিরূপে পরিণত করা শিক্ষা-সাপেক্ষ; গৃহ পরিবার এই শিক্ষা দিবার স্থান।

যাহারা বড় বাগান করিতে চায়, দেখিতে পাই তাহারা এক একটী nursery বা শিশু-বৃক্ষালয় স্থাপন করিয়া থাকে, যেখানে শিশুবৃক্ষগুলিকে রোপিয়া, শীতাতপে বাঁচাইয়া, সবল করিয়া পরে অনাবৃত প্রান্তরে রোপণ করে। তেমনি দেখ বিধাতা প্রতিদিন দাম্পত্য সম্বন্ধ দ্বারা ঘরে ঘরে শিশুবৃক্ষালয় স্থাপন করিতেছেন, যেখানে মানব সুরক্ষিত হইয়া নীতির নিয়মগুলি হৃদ্‌গত ও চরিত্রগত করিতে সমর্থ হয়।

একটু ধীর চিত্তে অনুধাবন করিলেই অনুভব করা যাইবে, কেন গৃহ পরিবার শিশুবৃক্ষালয়ের কাজ করে। মানব-চরিত্রের যে সকল সদ্‌গুণের উপর সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করে সে সকল সদ্‌গুণ স্বাভাবিক-রূপেই গৃহ পরিবারমধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রথম গুণ, স্বার্থত্যাগের শক্তি। যে সমাজের মানুষের অধি-কাংশের এই অবস্থা যে তাহারা পরহিতের জন্য সামান্য স্বার্থের ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না, সে সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ অসম্ভব। সামাজিক উন্নতির নিমিত্ত তাহার অঙ্গীভূত ব্যক্তিগণের স্বার্থত্যাগের শক্তি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। গৃহ পরিবার এই স্বার্থনাশের শিক্ষার কেমন উৎকৃষ্ট স্থান! যেখানে দাম্পত্য সম্বন্ধ সুগঠিত ও প্রকৃত প্রীতির উপরে স্থাপিত সেখানে পতি ও পত্নী উভয়েই আপনার সুখ ও স্বার্থকে দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া অপরের সুখ ও স্বার্থকে প্রথম স্থানে রাখিয়া থাকেন। ইহা কেমন শিক্ষা।

সামাজিক সুখ ও উন্নতির উপযোগী দ্বিতীয় গুণ দায়িত্ব-জ্ঞান ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা। ইহারও শিক্ষাস্থল গৃহপরিবার। সন্তানগণের ভাবী কল্যাণোদ্দেশে পিতামাতাকে কিরূপ সচিন্ত ও সচেষ্ট থাকিতে হয়, তাহা স্মরণ করিলে সহজেই অনুভব করা যায়, যে গৃহপরিবারের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণতার শিক্ষার স্থল অল্পই আছে।

তৃতীয় সদ্‌গুণ ন্যায়পরতা। ইহার অভাবে কোনও সমাজ উন্নত ও সুখী হইতে পারে না। গৃহ পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক বালক বালিকা এই জ্ঞানে বর্দ্ধিত হয়, যে সকলের অধিকার সমান। এককে বঞ্চিত করিয়া অপরে কিছু ভোগ করিতে পারে না। যদি কোথাও একজনকে তাহার প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা

গর্হিত কার্য্য হয়, তাহা গৃহের মধ্যে; সুতরাং ন্যায়-পরায়ণতার শিক্ষা এখানেই হইয়া থাকে।

তৎপরে ইহাও ভাবিতে হইবে যে পিতামাতার সন্নিধানে ও শাসনে রক্ষিত হইয়া সন্তানগণ গুরুভক্তি, বাধ্যতা, আনুগত্য, বিনয় প্রভৃতিতে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সামাজিক উন্নতি ও সুখের জন্য এ গুণগুলিও অল্প প্রয়োজনীয় নহে।

অতএব এই সত্যকে দৃঢ়রূপে ধরিতে হইবে যে সামাজিক নীতিকে সুরক্ষিত ও উন্নত করিতে হইলে প্রধানতঃ গৃহধর্ম্মের উন্নতির দিকে মন দেওয়া চাই।

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রাদিতেও দেখিতে পাই যে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ সামাজিক নীতিকে সুরক্ষিত করিতে গিয়া গার্হস্থ্য নীতির উপরে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক দিয়াছেন।

কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশে কেন, রামায়ণ প্রভৃতি ইতিহাস-শাস্ত্রে কি দেখিতে পাই? রামায়ণ প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট রাজনীতি ও সমাজনীতির নিদর্শন প্রদর্শনের উদ্দেশে লিখিত; কিন্তু তাহার সমুদয় শিক্ষা গার্হস্থ্য-নীতির উপরে স্থাপিত। রামচন্দ্রের ন্যায় পিতৃভক্ত কে? সীতার ন্যায় পতিব্রতা কে? লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ কোথায়? কৌশল্যার ন্যায় পুত্রবাৎসল্য কোথায় মিলে? ভরতের ন্যায় গুরুভক্তি, হনুমানের ন্যায় প্রভুভক্তি, বিভীষণের ন্যায় সাধুভক্তিই বা কি বিরল! যে সমাজে নরনারীতে এই সকল সদ্‌গুণ থাকে, সে সমাজ ত সুখী ও উন্নত হইবেই। তবেই ত সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, যে কেহ সামাজিক নীতির সংরক্ষণ ও উন্নতির বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারই দৃষ্টি তাহার ভিত্তিস্বরূপ গৃহধর্ম্মের উপরে পতিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক নীতির সংরক্ষণ ও উন্নতি নানা কারণে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমানে আমরা চিত্তের বিক্ষেপকারী নানা কারণের মধ্যে বাস করিতেছি। এক দিকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে বিবিধ প্রকার চিন্তা, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ভারতসমাজ মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে; সভ্যতার সহচর অনেক পাপ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতেছে; তাহারা এত দ্রুত আসিয়া সমাজ-দেহে প্রবেশ করিতেছে, যে একটীর প্রতি মনোনিবেশ করিতে না করিতে অপরটী আসিয়া উপস্থিত! অপর দিকে শাসনের আলি দিয়া আপনার ঘরে বসিয়া যে মনের মত করিয়া সন্তানগুলিকে গড়িব তাহা পারা যাইতেছে না, আমাদের প্রদত্ত শিক্ষাকে ভাঙ্গিবার জন্য নানা কারণ নানা দিক দিয়া উপস্থিত হইতেছে। আমি যে ভাবে গড়িতে চাহি চারিদিকের হাওয়া যদি তাহার প্রতিকূল হয়, তবে কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর।

আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি যে আমরা সামাজিক নীতিকে আর প্রাচীন ভূমির উপরে দণ্ডায়মান রাখিতে পারিতেছি না। প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থা সকল অনেক পরিমাণে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের উপদেশের অনুরূপ ছিল এবং সেগুলি সামাজিক নীতির রক্ষক ও পোষক ছিল। সে সকল সামাজিক ব্যবস্থা আমরা আর স্থির রাখিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি, হিন্দু একান্নভুক্ত-পরিবারপ্রথা আর দণ্ডায়মান রাখা যাইতেছে না। দ্রুতগামী রেলগাড়ি ভাইকে ভাই হইতে বহুদূরে, কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছে। স্বতন্ত্র উপার্জ্জন, স্বতন্ত্র অর্থসঞ্চয়, স্বতন্ত্র সুখ দুঃখ, সকলি স্বতন্ত্র হইয়া যাইতেছে। আর এখন বলিলে চলে না, "ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা"—জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ আর পিতার ন্যায় কনিষ্ঠদিগের বোঝা বহিতে চাহিতেছেন না। স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তি আমাদের গৃহধর্ম্মের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইতেছে।

এই স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া যুবকদিগের উপরে বৃদ্ধদের প্রাধান্য, সাধারণ মানুষের উপর দলপতিদের প্রাধান্য, নারীর উপরে পুরুষের প্রাধান্য, নিম্নশ্রেণীর উপরে উচ্চ জাতীয়দের প্রাধান্য প্রভৃতি সকল প্রকার শাসনকে শিথিল করিতেছে। এখন যেন এই ভাবটা বাড়িতেছে, কে কার দিকে চায়, কে কার মুখাপেক্ষা করে।

এই স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির প্রবলতাজাত সামাজিক-শাসন-শৈথিল্যের ফল চারিদিকে দেখা যাইতেছে। কলিকাতা

সহরে দেখিতেছি, বৃদ্ধ গুরুজন পার্শ্বের ঘরে বাস করিতেছেন ও বাড়ীতে শিক্ষিত নামধারী যুবক রঙ্গ ভূমির অভিনেত্রীদিগকে আনিয়া আমোদ করিতেছে।

সমাজের এমনি শোচনীয় অবস্থা, বিবাহিতা পত্নীদিগকে ফেলিয়া যুবক অভিনেতৃগণ রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে মগ্ন হইতেছে, আর ভদ্র পুরুষ ও মহিলাগণ পয়সা দিয়া তাহাদের এই গর্হিত আচরণে উৎসাহ দান করিতে যাইতেছেন। ইহা অপেক্ষা সমাজের অধোগতি অধিক কি হইতে পারে?

তৎপরে যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংশ্রবে আসিতেছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য জাতি সকলের চরিত্রগত পুরুষকার ও গুণাবলী যত গ্রহণ করিতে পারুন আর না পারুন, পাশ্চাত্য সমাজের প্রচলিত পাপগুলিকে সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ মনে করিয়া অবলম্বন করিতেছেন। এই আর এক শ্রেণীর আধা ইঙ্গ আধা বঙ্গ অনুকরণ-প্রিয় মানুষ দেখা দিতেছেন, যাঁহারা সভ্যতার নামে অসভ্যতাকে সমাজ-মধ্যে আনয়ন করিতেছেন।

পাশ্চাত্য সংস্রবজনিত স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির অনিষ্ট ফল দেখিয়া হা হুতোস্মি করিলে হইবে না; নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। বিধাতার বিধানে এ দেশে নব শক্তির সঞ্চার ও নব ভাবের উন্মেষ করিবার জন্য এই নব ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাতে কিছু দিন পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে। ইহা প্রাচীন পরতন্ত্রতার প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমাদিগকে ধীরতা ও দৃঢ়তার সহিত জাতীয় জীবনে ধর্ম্মভাবকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ ধর্ম্মভাবই কেবল এই স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তিকে সুপথে নিয়োগ করিতে পারে। যে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্যরূপে আসিতেছে তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদিগকে নূতন প্রণালীর গৃহ পরিবার, নূতন প্রণালীর সামাজিক শাসন সৃষ্টি করিতে হইবে।

জগতে দেখা যাইতেছে যে, যে জাতির গার্হস্থ্য জীবন ভাল, তাহাদের সামাজিক নীতিও ভাল। গার্হস্থ্য জীবনের কেন্দ্রস্থানে নারী। জগদীশ্বর সামাজিক নীতি রক্ষার ভার নারীদের প্রতি দিয়াছেন। এক্ষণে ভারত-সমাজে নারীগণ শিক্ষার ও স্বাধীনতার অভাববশতঃ এই কার্য্য সমুচিতরূপে করিতে পারিতেছেন না। আপনাদের প্রকৃত শক্তি ও কার্য্য না জানাতে তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। নারীগণ শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতার গুণে যখন আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি সাধনে সমর্থ হইবেন, তখন আমাদের গৃহ-পরিবার আর এক শ্রী ধারণ করিবে। গার্হস্থ্য নীতি ও সামাজিক শাসন আপনাআপনি জন্মগ্রহণ করিবে।

বহুদিনের শ্রমসাধ্য কার্য্য আমাদের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির ভিত্তি নারীকুলের উন্নতির উপরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। ভারত-নারীকে বন্দী দশা হইতে মুক্ত করিতেই হইবে; তদ্ভিন্ন এ দেশের কল্যাণ ও পরিত্রাণ নাই। ইহাকে একটি মৌলিক সত্য রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বন্দীদশা শব্দ যখন ব্যবহার করিতেছি তখন তাঁহারা যে অবরোধে আবদ্ধ, কেবলমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতেছি না। পারিবারিক অবরোধ অপেক্ষা মানসিক অবরোধ অধিক শোচনীয়। "আমরা উন্নততর কার্য্যের উপযুক্ত নহি," এই জ্ঞানের ন্যায় শোচনীয় অবরোধ আর নাই। "আমরা পশ্চাতে থাকিব, শ্রমভার বহিব, নিগ্রহ সহিব, পুরুষগণ যথেচ্ছাচার করিবে, আমরা দেখিব, কাঁদিব, মনের দুঃখ মনে যাপিব, এই আমাদের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট নিয়তি," এই জ্ঞানের ন্যায় বন্দী দশা আর নাই। আমরা নারীগণকে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানে উন্নত ও সামাজিক সম্মানে সম্মানিত দেখিতে চাই। সেইরূপ নারীরাই পুরুষ-হস্তীর মাহুতস্বরূপ হইতে পারিবেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—নারীগণকে কিরূপ শিক্ষা দিলে এই ফল ফলিতে পারে? উত্তর এই—যে শিক্ষা কেবল চরিত্রের উপরিভাগমাত্রকে স্পর্শ করে, যে শিক্ষা কেবল উঠিতে বসিতে, চলিতে বলিতে, লিখিতে পড়িতে শিখায়, যে শিক্ষা কেবল হাব ভাব, আদব আসবাব, বিলাস বসনাদিতে আপনাকে প্রকাশ করে, তাহাতে হইবে না; যে শিক্ষা

চিত্তকে কেবল বহির্মুখীন না করিয়া অন্তর্মুখীন করে, যে শিক্ষা মানুষকে দায়িত্ব-বোধের ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করে, যে শিক্ষা জীবিকা অপেক্ষা জীবনকে, প্রদর্শন অপেক্ষা সত্যকে, ক্ষতিলাভ গণনা অপেক্ষা ধর্ম্মকে অধিক মূল্যবান ভাবিতে শিখায়, যে শিক্ষা জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে দৃঢ়তা, মানবে প্রেম আনিয়া দেয়, যে শিক্ষা সংসারের সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ধরিবার, ছুঁইবার, প্রাণে রাখিবার ও আপনার বলিবার মত কিছু দেয়, সংক্ষেপে বলিতে গেলে যে শিক্ষা ঈশ্বর-চরণে মানব-মনকে ভাল করিয়া বাঁধে, সেই শিক্ষার প্রয়োজন। এই ভাবে শিক্ষিতা নারী যতই জনসমাজের উপর নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন, ততই নূতন সামাজিক শাসনের সৃষ্টি হইবে।

এই শিক্ষা গৃহ পরিবারেই দিতে হয়। বিদ্যালয়ে এরূপ শিক্ষা আশানুরূপ দেওয়া যায় না। এই কারণে শিক্ষিত গৃহস্থদিগের স্বীয় স্বীয় গৃহ-পরিবারে ধর্ম্ম-শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে যত্নশীল হওয়া উচিত। ঝড় উঠিলে পক্ষিণী যেমন শাবকগুলিকে ডানার মধ্যে লইয়া বসে, তেমনি প্রত্যেক গৃহস্থকে সভ্য সমাজের নানা চর্চ্চা, নানা আন্দোলন, নানা প্রলোভনের মধ্যে স্বীয় স্বীয় গৃহ পরিবারকে যথাসাধ্য আগুলিয়া, সুরক্ষিত করিয়া, বসিতে হইবে; এবং সর্ব্বপ্রযত্নে বালকবালিকাদিগকে উন্নততর ও উৎকৃষ্টতর গৃহ পরিবার নির্ম্মাণের উপযুক্ত করিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে। ইহা সুনিশ্চিত যে ভারতবাসীর গৃহধর্ম্মকে উন্নততর ও পবিত্রতর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে নব্য ভারতের সামাজিক নীতি কখনই উন্নত ও পবিত্র থাকিবে না।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

বৈদিক সমাজ-চিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম অধ্যায়।

আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের গার্হস্থ জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি; এখন তাঁহার আচার্য্যত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ —অতি অল্পমাত্র—বলিব। তিনি বেদবিৎ বলিয়া এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, যে চারিদিক হইতে বহুসংখ্যক বেদার্থী তাঁহার নিকট বেদ শিক্ষা করিতে উপস্থিত হইত। তখনকার সাধারণ প্রথা অনুসারে শিক্ষার্থীদিগের গুরুগৃহে থাকিবার কথা, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যসংখ্যা এত অধিক হইয়া উঠিল যে তাঁহার নিজগৃহে তাহাদিগকে রাখা অসম্ভব হইল। সুতরাং প্রসিদ্ধ বিদ্যানুরাগী জনকরাজের আদেশে ও অর্থসাহায্যে মুনির আশ্রমের সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড বিদ্যামন্দির নির্ম্মিত হইল। এই মন্দিরে বিদ্যার্থিগণ তদীয় সহযোগী অধ্যাপকগণের অধীনে বাস করিত। তিনি সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগের অধ্যাপনা করিতেন। শিক্ষার্থিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিবর্ণের বালকই ছিল, এবং উর্দ্ধে রাজবংশের সন্তান ও নিম্নে সাধারণ ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং কৃষক, সকল অবস্থার লোকই ছিল। কিন্তু আশ্রমে সকলেরই সমান আদর ও যত্ন হইত। সুখ, স্বচ্ছন্দতা, পরিশ্রম, কর্ত্তব্য, সকলেরই একরূপ ছিল; একরূপ আহার, একরূপ শয্যা, একরূপ ব্যায়াম; কেবল ক্ষত্রিয় বালকদিগকে অপর অধ্যেতব্য বিষয়ের সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষা করিতে হইত। আধুনিক জাতিভেদের কঠোর শৃঙ্খল তখন বর্ত্তমান ছিল না। বিদ্যার্থিগণ সকলেই একত্র পানাহার করিত, এবং পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিত। ব্যবসায়-ভেদবশতঃ তখন সবর্ণ বিবাহই অধিক প্রচলিত ছিল; কিন্তু মধ্যে মধ্যে অসবর্ণ বিবাহও অনেক হইত, বিশেষতঃ অনুলোম বিবাহ। অনুলোম বিবাহের অর্থ উচ্চ বর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রীর বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহ,

অর্থাৎ উচ্চবর্ণের স্ত্রী ও নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ তাদৃশ চলিত ছিল না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহাও হইত। রাজারা কেহ কেহ ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতেন, যেমন রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় কন্যাদিগের স্বয়ম্বরে জাতিভেদ একবারেই অগ্রাহ্য করা হইত। তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা অথবা যে পণে জয়ী হইত তাহাকেই বিবাহ করিতেন, তাহার জাতি দেখিতেন না। সুতরাং পাঠককে না বলিলেও বুঝিতে পারিবেন যে যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্যামন্দিরে ত্রিবর্ণের ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই পরস্পরে বংশ বা বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ ছিল, আর এই যে এক গৃহে স্বাধীন ভাবে সকলের বাসজনিত বন্ধুতা, এবং বন্ধুতাবশতঃ পরস্পরের পৈত্রিক আবাসে যাতায়াত, তাহাতে অনেক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের বীজ প্রোথিত হইতেছিল। ইহার ২।১টা দৃষ্টান্ত পাঠক যথাস্থানে দেখিতে পাইবেন।

যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্ব্বেদ-সংগ্রাহক বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনি ঋক্, সাম, যজু, তিন বেদেই পারদর্শী ছিলেন এবং এই তিন বেদেরই অধ্যাপনা করিতেন। তখনও অথর্ব্ব বেদ স্বতন্ত্র বেদরূপে সংগৃহীত হয় নাই। বেদত্রয় ছাড়া ষড়্ বেদাঙ্গও যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্যালয়ে অধ্যাপিত হইত। প্রত্যেক বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ছিলেন। যাহা হউক, যাজ্ঞবল্ক্য বেদত্রয় ও ষড়্ বেদাঙ্গে পারদর্শী হইলেও অন্যান্য বেদবিদ্যা অপেক্ষা শুক্ল যজুর্ব্বেদের শিক্ষার্থীই তাঁহার নিকট অধিক আসিত। মৈত্রেয়ীর সহিত বিবাহের অনেক বৎসর পরে এক দিন প্রাতঃকালে তিনি ন্যূনাধিক একশত ব্রহ্মচারীকে শুক্ল যজুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী ঘটনা ঘটিল। এই ঘটনার সহিত পর অধ্যায়দ্বয়ে বর্ণিত ঘটনার বিশেষ সম্পর্ক আছে, সুতরাং আমরা ইহার বিশেষ উল্লেখ করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ দুই দণ্ডকাল চলিতে না চলিতেই তিনি ও ছাত্রগণ আশ্রম দ্বারের নিকট গম্ভীর রথচক্রের শব্দ শুনিতে পাইলেন। পর মুহূর্ত্তেই দ্বারবান্ মুনির সমক্ষে আসিয়া বলিল, "আর্য্য, চতুরশ্বযুক্ত বৃহৎ রথে সেনাপতি মন্দির দ্বারে উপস্থিত; তাঁহার সঙ্গে একটি সুন্দরকায় যুবক। সেনাপতি আপনার দর্শনপ্রার্থী; কি আদেশ হয়?" সেনাপতি পাঠকের পূর্ব্ব-পরিচিত ক্ষত্রিয় যজ্ঞদত্ত, যিনি তদীয় সঙ্গী বিষ্ণুমিত্র সহ এককালে মুনির প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সেই ঘটনার পর এই কতিপয় বৎসরের মধ্যে তিনি বহুবিধ গুণের প্রভাবে, বিশেষতঃ শৌর্য্য, বীর্য্য ও যুদ্ধকৌশল বশতঃ জনক রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করিয়া এখন যুদ্ধবিভাগের উচ্চতম পদ সেনাপতিত্বে বরিত হইয়াছেন। কিন্তু এই উন্নত রাজপুরুষ আজ বেদাচার্য্যের দ্বারে উপস্থিত কেন? বন্ধুদ্বয়ের সমাগমে যে কথোপকথন আরম্ভ হইল তাহা হইতেই ইহার কারণ জানিতে চেষ্টা করা যাক্:—

যজ্ঞদত্ত—"আর্য্য, আপনার কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যে প্রয়োজনে আসিয়াছি তাহা আপনার পবিত্র কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাই আসিতে সাহস করিলাম; ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

যাজ্ঞবল্ক্য—"সখে, আমি এই ব্যাঘাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। আপনার ন্যায় বন্ধুর সমাগমই অতীব আনন্দকর; তারপর, পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ, আর জ্ঞানদীপ্তি-সমুজ্জ্বল ভবদীয় মুখমণ্ডল দর্শন, এই দুয়ে বিশেষ প্রভেদ নাই। কিন্তু আপনার সঙ্গে এ কে?" এই বলিয়া মুনি সেনাপতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান যুবকের সুগঠিত ও দীপ্তিপূর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

যজ্ঞদত্ত—"ইহারই জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। এই যুবকের নাম ব্রহ্মগুপ্ত। বারাণসীর প্রসিদ্ধ বণিক ইন্দ্রগুপ্তের নাম ও যশের কথা আপনি শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। এই যুবক তাঁহার পুত্র। সেই মহাসভার সময়ে আমি যখন রাজাদেশে বারাণসীতে যাই, তখন ইন্দ্রগুপ্তের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। তার পর অনেকবার তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে এবং প্রথম আলাপ গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। উভয় পরিবারের মহিলা এবং বালক

বালিকাগণও পরস্পরের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত। সম্প্রতি বন্ধুবর আমার প্রতি এই বিশেষ প্রীতি ও সম্মানের নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রিয়পুত্র ব্রহ্মগুপ্তকে আমার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিবার জন্য এই নগরে পাঠাইয়াছেন। ইহার বয়স এখন অষ্টাদশ বৎসর। ইতিমধ্যেই সে বেদবিদ্যায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু আপনার গভীর বিদ্যাবত্তা ও অধ্যাপন-কৌশল অবগত হইয়া ইন্দ্রগুপ্তের এই ইচ্ছা হইয়াছে যে আপনার অধীনে তাঁহার পুত্রের বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয়। এই বিদ্যামন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাকে, আপনি এবং আপনার সহযোগিগণের নিকট যাহা কিছু শিক্ষণীয়, তাহা শিখিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিষ্ণুমিত্রের অধীনে যুদ্ধশিক্ষা করিতেও কিছু সময় দিতে হইবে।"

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ক্ষত্রিয় বিষ্ণুমিত্রও যজ্ঞদত্তের ন্যায় নিজ গুণ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া এখন মিথিলার রাজকীয় যুদ্ধবিদ্যালয়ের ধনুর্ব্বেদাচার্য্য বা প্রধান উপদেষ্টার পদে বরিত হইয়াছেন। যাহা হউক, বন্ধুদ্বয়ের কথাবার্ত্তা পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

যাজ্ঞবল্ক্য—"আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে ব্রহ্মগুপ্ত বৈশ্য হইয়াও যুদ্ধবিদ্যায় অনুরাগী। লোকে মনে করে যুদ্ধবিদ্যা কেবল ক্ষত্রিয়েরই উপযোগী। কিন্তু আমার মত এই যে কেবল ব্যবসায়গত বিশেষ জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নহে; আমাদের জীবন রক্ষা, সুখভোগ এবং মুক্তিলাভ, এই সমুদায়ের সাধক যাহা তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। সেই জন্যই আমার শ্যালক মৈত্রেয় যে অগ্নিমিত্রের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করে, তাহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট।"

এই বলিয়া মুনিবর তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান একটী সুশ্রী ও সবলকায় যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে অগ্নিমিত্র বিষ্ণুমিত্রের কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি জনকরাজের যুদ্ধবিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক। যাহারা সাধারণ ভাবে অস্ত্র শিক্ষা করিতে চাহিত তাহাদিগকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। যাহা হউক, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"হয়তঃ তাহার অধীত বিদ্যা কার্য্যে লাগাইবার তাহার কোন প্রয়োজনই হইবে না, কিন্তু দেখিতেছেন ব্যায়াম শিক্ষাতে তাহার দেহ কেমন সুস্থ ও সবল হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন।

যজ্ঞদত্ত—(সহাস্যে মৈত্রেয়ের প্রতি তাকাইয়া)—"মৈত্রেয়ের নিজ শরীরের প্রতি যত্ন ও আমাদের ক্ষত্রিয় বিদ্যায় অনুরাগের কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তাহার পিতৃগৃহে আর বিষ্ণুমিত্রের ভবনে তদীয় প্রিয়দর্শন ক্ষত্রিয়গৌরব ও ক্ষত্রিয়কুলের আশার স্থল যুবকবৃন্দের সমভিব্যাহারে মৈত্রেয়কে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। কিন্তু কে জানিত যে এক বেদাচার্য্যের পুত্র এবং অপর বেদাচার্য্যের শ্যালক আবার একজন যোদ্ধা হইয়া উঠিতেছে? কি বল, মৈত্রেয়?"

মৈত্রেয়—(সস্মিতমুখ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া)—"আজ্ঞে, আমার পিতৃব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু বাল্যকালে যে শুনিয়াছিলাম যে আপনি ও ধনুর্ব্বেদাচার্য্য মহাশয় আমার আচার্য্যদেবের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছি যে ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষা কেবল ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে, প্রত্যেকেরই জীবনরক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য এই সমুদায় শিক্ষা করা উচিত। আপনারা দুজন না থাকিলে আচার্য্যদেব এবং পিতৃদেবের কি দশা হইত, ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়!"

যজ্ঞদত্ত—"তোমার অভিপ্রায় শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের পক্ষে অস্ত্রশিক্ষার প্রয়োজন আরো অধিক। তাহার পিতার বহুমূল্য পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য নানা দূর দেশে প্রেরিত হয়। দস্যুর আক্রমণ হইতে এই সকল রক্ষার জন্য তৎসঙ্গে ধনু ও অসিধারী এক একটী সৈনিক দল পাঠাইতে হয়। ব্রহ্মগুপ্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে এরূপ এক একটী সৈনিকদলের নেতৃরূপে স্থানে স্থানে যাইতে হইবে। কোন কোন স্থানের, বিশেষতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বত ও তন্নিকটবাসী দস্যুগণ এমন দুর্জ্জেয় যোদ্ধা যে

অতীব রণকৌশল সেনা ও সেনাপতি ব্যতীত তাহাদিগকে পরাভূত করা অসম্ভব। ব্রহ্মগুপ্তকে একাধারে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ও শ্রেষ্ঠ বৈশ্য হওয়া আবশ্যক।"

মন্দিরদ্বারে উচ্চ ঘণ্টারব শুনিয়া যজ্ঞদত্ত নীরব হইলেন। বুঝিলেন প্রাতঃকালের অধ্যাপনা শেষ হইল। সুতরাং কথোপকথনে নিবৃত্ত হইয়া বন্ধুদ্বয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাবিধি ব্রহ্মগুপ্ত যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিলেন। যজ্ঞদত্ত ব্রহ্মচারীদিগের অবস্থানের আয়োজন সম্বন্ধে ২।৪টী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য অধ্যাপকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমদ্বার পর্য্যন্ত গেলেন। রথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে যজ্ঞদত্ত তাঁহাকে বলিলেন, "অধ্যয়ন হইতে যখনই অবকাশ পাইবে, অধ্যাপকদিগের অনুমতি লইয়া আমাদের বাড়িতে যাইবে।" ব্রহ্মগুপ্ত "তথাস্তু" বলিয়া ভক্তিভরে পিতৃবন্ধুকে প্রণামপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

অধ্যাপক কুরী।

গত ১৯এ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ফরাসী জাতির এক দুর্দ্দিন গিয়াছে। সেদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে জগদ্বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক কুরী একাকী রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন। পথে মালবোঝাই ভারী গাড়ীর ঘোড়ার সহিত ধাক্কা লাগিয়া কুরী পিচঢালা রাস্তায় পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান। সেই গাড়ীর পশ্চাতের এক খানি চাকা মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে মস্তক চূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর অনেক ক্ষণ অবধি কেহই বুঝিতে পারে নাই, কাহার এমন শোচনীয় মৃত্যু ঘটিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা কুরীর মৃত দেহ নিকটবর্ত্তী এক ঔষধ-বিক্রেতার দোকানে লইয়া গেল, কিন্তু দোকানী স্থান নাই বলিয়া তাহার দোকানে শব রাখিতে দিল না।

অধ্যাপক কুরী।

অন্য উপায়ের অভাবে আধ ঘণ্টা ধরিয়া কুরীর শব রাস্তার কাদার উপরে পতিত রহিল, তাহার পর এক খানা খাটিয়া সংগ্রহ করিয়া তাহা নিকটবর্ত্তী থানায় নীত হইল। পুলিস কুরীর পকেটে কাগজ পত্র অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইল। অধ্যাপক কুরীর ৭৫তিপর বৃদ্ধ পিতা পরিবারের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় গৃহে আসিয়া কুরীর পত্নী এই ঘটনা শুনিলেন। তিনি অতিশয় বিদুষী রমণী। যে রেডিয়ম আবিষ্কার করিয়া কুরী এত অল্প দিনের মধ্যে জগৎব্যাপী যশ অর্জ্জন করেন, তাহা পতিপত্নীর সম্মিলিত গবেষণার ফল। ইহার আবিষ্কারে কাহার কৃতিত্ব অধিক, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। শ্রীমতী কুরী পোলাণ্ড দেশীয় এক বৈজ্ঞানিকের দুহিতা, শিক্ষালাভের উদ্দেশে প্যারী নগরীতে আগমন করেন। তথায় তিনি কুরীর সহাধ্যায়ী এবং এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে তাঁহার সহিত একত্রে নানা গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ছাত্র জীবনের এই মধুর সখিত্ব কালক্রমে পরিণয় সম্বন্ধে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পরে জ্ঞানানুশীলনলব্ধ প্রচুর যশ উভয়ে একত্রে ভোগ করিবার স্পৃহণীয় সৌভাগ্য ইহাঁরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃঃ অব্দে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি পতি পত্নী উভয়কে ডেভি পদক পুরস্কার দেন এবং সেই বৎসরে তাঁহারা উভয়ে নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। নারীগণ যখন শিক্ষাবলে সমাজ মধ্যে

তাঁহাদের প্রকৃত অধিকার স্থাপন করিতে পারিবেন, তখন তাঁহারা সমগ্র মানব জাতির উপর এই প্রভাব বিস্তার করিবেন। সুশিক্ষিতা, মহাপ্রাণা, পবিত্রহৃদয়া নারীর প্রভাব সমাজের কতদূর কল্যাণকর, মানব সমাজ তখন তাহা অনুভব করিয়া ধন্য হইবে।

সমগ্র ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা প্রীতি ও গৌরবজড়িত মুগ্ধ দৃষ্টি এই পণ্ডিত দম্পতির উপরে পতিত ছিল। মৃত্যু-কালে কুরীর বয়ক্রম সাতচল্লিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। সকলে আশা করিয়াছিলেন, যে এই অসামান্য প্রতিভা-শালী দম্পতি বিজ্ঞানের আরও গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জাতীয় গৌরব আরও বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। ছাত্রজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানানুশীলন, যশ ও জাতীয় গৌরব অর্জ্জনে যিনি উচ্চতম অর্থে পতির সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তাঁহার অনাবিল দাম্পত্য সুখের এই রূপ আকস্মিক অবসানের কথা চিন্তা করিয়া কোন্ রমণীর প্রাণ না তাঁহার শোকে আকুল হইয়া উঠে?

অধ্যাপক কুরী বিজ্ঞানের প্রকৃত সেবক ছিলেন। তিনি জ্ঞানের অন্বেষণেই জ্ঞানের পুরস্কার আকাঙ্ক্ষা করিতেন, ইহা হইতে ঐহিক সুখলাভের নীচ কামনা তাঁহার মহৎ অন্তরে স্থান পাইত না, এই জন্য ফরাসীজাতির স্পৃহনীয় উপাধি Legion of Honour তিনি প্রাপ্ত হইয়াও গ্রহণ করেন নাই। চিরদিন সর্ব্বপ্রকার পার্থিব আড়ম্বর ও ভোগ বিলাস হইতে আপনাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিয়া কেবল নিষ্কাম জ্ঞানের সাধনায় রত থাকিয়া তিনি ভারতীয় ঋষিগণের ন্যায় নিস্পৃহ পবিত্র জীবন যাপন করিতেন; জীবিতকালে যেরূপ পার্থিব সম্মান গ্রহণ করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত ছিলেন মৃত্যুর পরও যাহাতে তাঁহার শবের প্রতি কোন প্রকার জাতীয় সম্মান প্রদর্শিত না হয়, তৎপ্রতি তাঁহার স্পষ্ট নিষেধ ছিল। তাঁহার পত্নী পতির এই ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে উপস্থিত হইতে তিনি কাহাকেও আহ্বান করেন নাই; কেবল শোকাতুর পরিবার ও যে বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক ছিলেন, তথাকার কয়েকজন অধ্যাপক—যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্য ছিলেন—সেই শোক ছবি প্রত্যক্ষ করিতে উপস্থিত ছিলেন। কুরীর শবাধার কেবল এক খানি কৃষ্ণ বস্ত্রে আবৃত হইয়া তাঁহার ভোজন গৃহে রক্ষিত ছিল। মৃতের আদেশ পালন জন্য তাহার উপরে এক গাছি পুষ্পমাল্যও কেহ প্রদান করেন নাই। শবাধারের সম্মুখে মূর্ত্তিমতী দীনতার ন্যায়, শরীরিণী বিরহ-ব্যথার ন্যায়, প্রস্তরে গঠিত নিশ্চলা পুত্তলীর ন্যায়, কুরী-পত্নী উপবিষ্ট ছিলেন। সাশ্রুনেত্র শিষ্যমণ্ডলী সে বজ্রাহত মূর্ত্তির সম্মুখে কেহ অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

শববাহী শকট ধীরে ধীরে প্যারী নগরের অনতি দূরবর্ত্তী শ্মশানে উপস্থিত হইল, তথায় পারিবারিক সমাধিতলে কুরীর দেহ সমাহিত হইল, তখন শিষ্যগণ গুরুর শবাধারের উপর ভক্তিনম্র চিত্তে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিলেন। নীরবে ফ্রান্স গগনের এক উজ্জ্বল তারকা অদৃশ্য লোকের গাঢ় অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু।

দৈব উপদ্রব।

বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাত—১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস ভূগর্ভের প্রবল বিক্ষেপের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই মাসে লাস্‌পাল্‌মাস্ নামক স্থানের দীর্ঘকালসুপ্ত আগ্নেয় গিরি পুনরায় অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ও ফরমোসা দ্বীপে প্রবল ভূমিকম্প অধিবাসীগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুরন্ত বিসুবিয়স পর্ব্বত পুনরায় ক্ষিপ্ত হইয়া কয়েকটী গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ করিয়া ফেলিয়াছে। কত যুগযুগান্তর হইতে বিসুবিয়স প্রকৃতির রম্যকানন সদৃশ স্বীয় চতুষ্পার্শবর্ত্তী ভূভাগ ও সুরম্য জনপদকে বিধ্বস্ত করিয়া আসিতেছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতে অসমর্থ, কারণ ঐতিহাসিক

যুগের পূর্ব্বাবধি বিসুবিয়স অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। ৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। সেই অগ্ন্যুৎপাতে সুপ্রসিদ্ধ পম্পী ও হারকিউলিয়ম নামক নগরদ্বয় ভস্মরাশি ও ধাতব স্রাবে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পৃথিবী-পৃষ্ঠে তাহাদের আর চিহ্নমাত্র ছিল না। এখন মৃত্তিকা খনন করিয়া পুনরায় সেই নগর দুইটী আবিষ্কার করা হইয়াছে। সেই আঠার শত বৎসর পূর্ব্বের কত দ্রব্য, কত দৃশ্য এতদিন পরে আবার অপূর্ব্ব উপায়ে লোকলোচনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

সেই প্রথম খৃষ্টাব্দের উৎপাতের পর অল্পাধিক পরিমাণে বহু শতবার বিসুবিয়স অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছে, তন্মধ্যে ১৬৩১ খৃষ্টাব্দের উৎপাতই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় তরল ধাতু নিঃস্রব নির্গত হইয়া বহুমুখে তাহা সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল; প্রায় বিশ হাজার লোক সেই উৎপাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই সময় হইতে গত এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বিসুবিয়স সম্পূর্ণ শান্ত না হইলেও বিশেষ কোন উৎপাত করে নাই। গত ৪ঠা এপ্রিল হঠাৎ বিসুবিয়স পুনরায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। দুই তিন দিনে বিসুবিয়সের চতুষ্পার্শবর্ত্তী নগর ও গ্রামসমূহ প্রায় ছয় ফিট গভীর উত্তপ্ত ভস্মরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কত নরনারী এই বিপদে প্রাণ হারাইয়াছে, কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু এই সকল দুর্ঘটনার মধ্যেও মানব হৃদয়ের মহত্ত্ব ও অপূর্ব্ব কর্ত্তব্য ও জ্ঞাননিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া পৃথিবীবাসী মুগ্ধ হইয়াছে। ইতালীরাজ সহৃদয় ভিক্টর ইমানুয়েল ও তাঁহার মাতা প্রজাগণের দুঃখে কাতর হইয়া এই দুর্দ্দিনে অগ্ন্যুৎপাত-ক্লিষ্ট অতি বিপদাকীর্ণ স্থান সমূহেও ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগকে আশ্বাস ও সাহস প্রদান করিয়াছেন। প্রাণভয়ে তাঁহাদের সঙ্গীয় লোকেরা যে সকল স্থানে যাইতে ভীত হইয়াছে তাঁহারা সেই সকল স্থানেও গমন করিয়া বিপন্ন প্রজাদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ধন্য সেই রাজা স্বীয় প্রজার দুঃখবিপদে যাঁহার প্রাণ এরূপ কাতর হয়। ধন্য সেই মনস্বিনী নারী—সেই রাজমাতা—যিনি সঙ্গে থাকিয়া কর্ত্তব্য সাধনের জন্য স্বীয় সন্তানকে মৃত্যুর কবলে লইয়া যাইতে ভীত হন না।

এই দৈব দুর্ঘটনা আর একটী মহৎ দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। কতকাল যাবৎ বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাত চতুষ্পার্শবর্ত্তী নরনারীকে বিপন্ন করিতেছে, কিন্তু মানবীয় শক্তি ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরির ধাতু নিঃস্রাব সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্ব আলোচিত হইতেছে; বিসুবিয়স পর্ব্বতেও এজন্য একটী মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক ম্যাটুসী নামক এক সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই মানমন্দিরের অধ্যক্ষ। ইনি

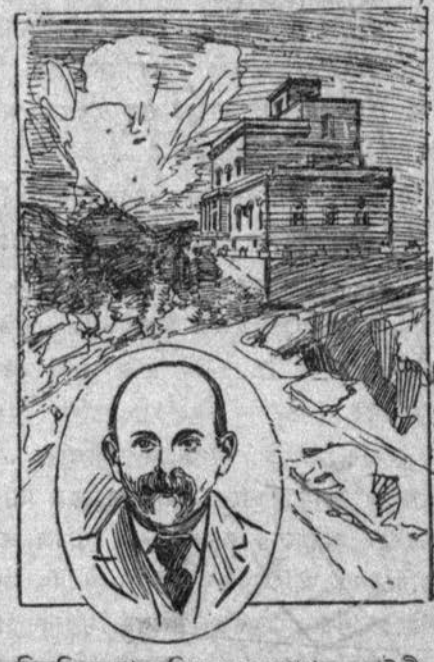

বিসুবিয়স-মানমন্দির ও অধ্যাপক ম্যাটুসী।

ভূকম্প ও আগ্নেয় গিরি সম্বন্ধে অনেক গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বহু মূল্যবান যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া ইনি মানমন্দিরে বাস করিয়া অগ্ন্যুৎপাত বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রকার

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো।

গভীর জ্ঞানস্পৃহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে অতি বিরল। ইতালীরাজ এই জ্ঞানবীরকে উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করিয়া ইঁহার জ্ঞানস্পৃহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

সানফ্রান্‌সিস্কোর ভূমিকম্প—কিন্তু বিসুবিয়সের এই অগ্ন্যুপাত অপেক্ষাও সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর ভূমিকম্প গুরুতর অনিষ্ট করিয়াছে। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো প্রশান্ত মহাসাগর-তীরে যুক্ত রাজ্যের একটী প্রধান নগর। জনসংখ্যায় ইহা যুক্ত রাজ্যের নবম সহর। গত ১৮ই এপ্রিল উষাকালে অধিকাংশ নগরবাসী যখন নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিল, তখন সহসা সমগ্র নগর প্রবল আন্দোলনে কম্পিত হইয়া উঠিল, সেই কম্পনে সহস্র সহস্র অট্টালিকা ভূপতিত হইল, নিদ্রিতদিগের অত্যল্পই ইহলোক জাগ্রত হইল। প্রথম কম্পন তিন মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ প্রাসাদসম অট্টালিকা ধূলিসাৎ হইল, সহস্র সহস্র নর-নারী মৃত্যুমুখে পতিত হইল; কত ব্যয়ে, কত বৎসরে নির্ম্মিত বিশাল নগর বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইল। গ্যাস ও বিদ্যুতের কারখানা ভাঙ্গিয়া আগুন লাগিয়াছিল, সেই আগুন আর কিছুতেই নিভান গেল না। ভূমিকম্প যাহা অবশিষ্ট রাখিয়াছিল, অগ্নি তাহা ভস্মসাৎ করিয়া

গেল। ২৫ বর্গ মাইলব্যাপী সহরটী প্রায় সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেণ থামিল, আমি সম্মুখেই মিঃ দত্তকে দেখিলাম। তিনি আমায় সযত্নে ট্রেণ হইতে নামাইয়া গাড়ীতে তুলিলেন, বেহারার উপর জিনিষ পত্রের ভার দিয়া আসিলেন। গাড়ী দ্রুত বেগে ছুটিল, কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদের আবাস বাটীতে প্রবেশ করিল, গাড়ী আসিয়া গাড়ীবারান্দায় থামিবা-মাত্র হাস্যপ্রফুল্ল মুখে মিসেস্ দত্ত আসিয়া আমার হাত ধরিয়া লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তাহা অতিশয় যত্নের সহিত সজ্জিত ছিল। মিসেস্ দত্ত আমাকে বলিলেন, আর দুই দিন বাদে তাঁহারা কর্ম্মস্থানে যাইবেন। দুই দিনের মধ্যে না আসিলে কি হইত কে জানে। আহারাদির পর মিসেস্ দত্ত আমাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। আমিও ক্রমাগত অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় অতিশয় কান্ত হইয়াছিলাম, সেই কোমল শয্যাতলে পড়িবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন চক্ষু মেলিলাম, দেখি গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে ও অদূরে একটী আসনে মিসেস্ দত্ত বসিয়া আমার প্রতি চাহিয়া আছেন। সেই দুটি করুণ নয়নে যেন স্নেহ উথলিয়া উঠিতেছে। আমি উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, "মাসীমা, আমি খুব ঘুমাইয়াছি।" তিনি সস্নেহে বলিলেন, "সন্ধ্যা হইয়াছে, তাই দেখিতে আসিলাম, এখন চল, মুখ হাত ধুইয়া এস, একটু বাতাসে বসিবে চল।"

আমি যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হইয়া আসিলাম। আমরা বারান্দার এক পার্শ্বে অন্ধকারে দুখানা বেত্রাসনে দুই জনে বসিলাম। মিসেস্ দত্ত আমার নিকটে বসিয়া আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "তাহার পরে কি হইল?"

আমি সেই স্নেহের কণ্ঠস্বরে চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না, অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিলাম, "সবই ভাঙ্গিয়া গেল; আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, যে আশা করিয়া-ছিলাম, দেখিলাম তাহা কিছুই না।"

তিনি বলিলেন, "সব কথা বল শুনি।" আমি ধীরে ধীরে সকল কথাই বলিলাম। তিনি নীরবে সকল কথা শুনিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি বেশ করিয়াছ। যদি সুরেশকে বিবাহ করিতে তা'হলে তোমার উপযুক্ত কাজ হইত না। কিন্তু সুরেশের কি জঘন্য নীচতা, কোন্ সাহসে তিনি এ প্রকার ব্যবহার করিলেন, আশ্চর্য্য!" আমি নীরবে রহিলাম। মিসেস্ দত্ত পুনরায় সস্নেহে বলিলেন, "তুমি আমার সহিত ভাগুারায় যাইবে?"

আমি বলিলাম, "কেন আমায় আবার গলগ্রহ করিবেন? আমার একটা চাকরী স্থির করিয়া দিন্।"

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "দুষ্টু মেয়ে, ওকি কথা, আমার ছেলে দুটি বিলাতে চলে গেছে, মিঃ দত্ত প্রায় ক্যাম্পে ক্যাম্পে থাকেন, অনেক সময় আমায় একা থাকিতে হয়। আমার কাছেই তোমায় থাকতে হবে।"

আমি পুনরায় বলিলাম, "কিছু কাজ করিলে হানি কি?"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "সে সব পরে হবে, এখন আমি যা বলিলাম তাই কর। পরশু দিনই আমরা বাহির হব তা জান? এখন টুরের সময়, শীঘ্র না গেলে নয়।"

আমি আর তাঁর কথায় দ্বিরুক্তি করিলাম না। জগদীশ্বর যে আমায় অকূল পাথারে কূল দিলেন সে জন্য নীরব হৃদয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

আমরা কলিকাতা ছাড়িয়া চলিলাম, আমার জীবনে যে এত বড় বৃহৎ ঘটনা ঘটিল আমি যেন তাহা ভুলিয়া চলিলাম। কৃপণের সযত্নে রক্ষিত ধনের মত, সেই ফটোখানি, অতি যত্নে, অতি গোপনে লুকাইয়া রাখিয়া-

ছিলাম। যাহা আমার হইবে বলিয়া কত আশাভরা তৃষায় কত সময় বসিয়া সেই মুখের প্রতি চাহিয়া কত আলোচনা করিতাম, এখন সে মুখের প্রতি চাহিবার আমার অধিকার নাই। নাই বা কেন? চাহিলে ত কাড়িয়া লইব না বা তাহা আমার হইবে না। আকাশে চন্দ্রমা উঠিলে সকলেই কি তাহার প্রতি চাহে না? আমার ভালবাসা ত কোন স্বার্থ কামনা করে না, আমি মনুষ্যের চরণে আমার প্রাণ সমর্পণ করি নাই, শুধু সেই এক খানি কাগজের আলেখ্য, সেই আমার হৃদয়ের দেবতা হইয়া হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল। শত বার চেষ্টা করিয়াও, কতবার অন্যমনস্ক হইয়া নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও আমি ভুলিতে পারি না। সুরভি পুষ্পের নিকট ভ্রমর যেমন গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়, আমার হৃদয়ের বিকশিত প্রেমপুষ্পের নিকট সেই একখানি মুখ সারা দিন রাত জাগিয়া রহিল। মিসেস্ বসু কি প্রকারে তাঁহাকে বলিলেন "তোমার ছবি!" কি লজ্জার কথা! মনে হইলে আমার হৃদয় লজ্জায় যেন ফাটিয়া যাইবার মত হয়। তিনি কি ভাবিলেন? ভাবিলেন, কি দুঃসাহস! ভাবিলেন, আমার মত লজ্জাহীনা রমণী বুঝি আর ইহজগতে নাই।

আমরা ভাণ্ডারায় নিরাপদে উপস্থিত হইলাম। ইহা মধ্য-ভারতবর্ষের একটি দেশ। আমরা যখন ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, দেখিলাম মিঃ দত্তের চাপরাশী ও অনুচরবর্গ টঙ্গা গাড়ী লইয়া সে স্থানে অপেক্ষা করিতেছে। আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম, সুপরিষ্কৃত পথ, পথের দুই ধারে সজ্জিত অশ্বত্থশ্রেণী। টঙ্গা সিভিল ষ্টেসনে প্রবেশ করিল। একটি সুন্দর সুপরিষ্কৃত কুসুমিত লতাচ্ছাদিত খড়ের বাঙ্গলা। বৃহৎ কম্পাউণ্ড, বাটীর সম্মুখে ফুলের বাগান, এক পার্শ্বে টেনিস্ গ্রাউণ্ড। আমরা বাঙ্গলায় প্রবেশ করিলাম। মিসেস্ দত্ত আমাকে বাটীর এক অংশ ছাড়িয়া দিলেন। উভয়ে কয়েক দিন গৃহ-কর্ম্মে ও গৃহের শৃঙ্খলায় ব্যস্ত রহিলাম। মিঃ দত্ত কয়েক দিন পরে ক্যাম্পে বাহির হইবেন, আমরাও সঙ্গে যাইব স্থির হইল।

একদিন অতি প্রত্যূষে আমরা বাহির হইলাম, বেলা দশটার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। একটি পরিষ্কার আম্র কাননে আমাদের তাঁবু সংস্থাপিত হইয়াছে। দুইটি বৃহৎ আম্র বৃক্ষতলে আমার শয়ন কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা কয়েক ঘণ্টা টঙ্গায় আসিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আহারাদির পরে মনের সাধ মিটাইয়া বিশ্রাম করিলাম।

সেই মুক্ত আকাশতলে, মুক্ত বাতাসে কি আনন্দ। আমরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পদব্রজে একটু ভ্রমণ করিতাম। কত গ্রামের নিকট দিয়া যাইতাম, সেই নিস্তব্ধ ছায়ারত গ্রামগুলি কি সুন্দর দেখাইত। প্রতি গ্রামের নিকট স্বচ্ছসলিলা সরোবর প্রকৃতির এক একটী বৃহৎ আরসীর মত দেখাইত। সেই সরোবরে গ্রামের ছায়া যেন ভাসিয়া বেড়াইত। আমরা যখন গ্রামের নিকটে যাইতাম, গ্রামবাসী বালক বালিকা ছুটিয়া আসিয়া "মেম সাহেব সেলাম" বলিয়া অভিবাদন করিত। মিসেস্ দত্ত সস্নেহে তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রত্যহ গ্রামবাসীরা কিছু না কিছু দ্রব্য উপহার আনিত। কোন দিন কেহ একটা লাউ কুমড়া, কোন দিন বা কেহ দু চারিটি ঝিঙ্গে বেগুন, কখনো কেহ শাক সবজী, কেহ কিছু দুধ ঘি আনিত। মিসেস্ দত্ত কতবার মানা করিতেন, তবু তাহারা ডাক্তার মেম সাহেবের মনো-রঞ্জনার্থে কিছু না কিছু আনিয়া উপস্থিত করিত। তিনিও তাহাদের সন্তানদিগকে কখনো দু একটা জামা, কখনো বা খেলেনা মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সংগ্রহ ছিল। আর মিঃ দত্ত, তিনি যে স্থানে যাইতেন সে স্থানে দুঃখীর বাপ মা ভরসা হইতেন। তাঁহার দয়াতে গ্রামবাসীরা মুগ্ধ হইত।

এই প্রকারে আমরা মধ্যে মধ্যে ক্যাম্পে আসিতাম, আবার ভাণ্ডারায় ফিরিয়া যাইতাম। গ্রীষ্মকালে আমরা ভাণ্ডারায় রহিলাম। মিসেস্ দত্ত মধ্যে মধ্যে কাহারও বাটী যাইতেন, তিনি কদাচিৎ ক্লবে যাইতেন। তাঁহার সন্তান দুইটির জন্য তাঁহার হৃদয় বড় কাতর হইয়াছিল; একটি ষোড়শবর্ষীয় ও একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়; আর দুই বৎসর গেলে উভয়ে গিয়া বিলাতে বাস

করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই প্রকারে বৎসর গত হইল। আমি আমার মামীমার নিকট হইতে কোনও সংবাদ পাই নাই। আমি দার্জ্জিলিং হইতে আসিবার পর তাঁহাকে বিস্তারিত সংবাদ দিয়াছিলাম, তবু তিনি একবারও আমার সংবাদ লন নাই। আমি মধ্যে মধ্যে মিসেস্ দত্তকে বলিতাম, "আমার একটি চাকরী স্থির করিয়া দিন্।" তিনি হাসিয়া বলিতেন, "কেন মাসীমার নিকট বুঝি কষ্ট হইতেছে?" আমি নীরবে থাকিতাম, আমার সাধ্যমত যত্ন সেবা ও গৃহকর্ম্ম করিতাম। এই প্রকারে বৎসর গত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আবার ডিসেম্বর মাস আসিল। আমাদের ক্যাম্পে যাইবার জন্য সমস্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত, তাঁবু ইত্যাদি সব চলিয়া গেল। যেদিন আমরা যাত্রা করিব, সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে মিঃ দত্ত, মিসেস্ দত্তকে বলিলেন শুনিলাম, "একটা কথা শুনেছ?" মিসেস্ দত্ত বলিলেন "কি?" মিঃ দত্ত বলিলেন, "আমাদের এখানে যে একজন নূতন ডেপুটী কমিশনর আস্‌ছেন, তিনি বাঙ্গালী।" মিসেস্ দত্ত একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "সত্যি?" তার পরে আমায় তাঁর হস্তস্থিত টাকা ও রসিদ দিয়া বলিলেন, "মণি, রামুকে ষ্টেসনে এই রসিদ দিয়ে পাঠাও, আমাদের ষ্টোরের সকল জিনিস আজ আসবার কথা, ওগুলা না এলে ত কাল যাওয়া সম্ভব নহে।"

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে রসিদখানি লইয়া চলিয়া আসিলাম। তাঁহাদের কথা আর শুনিতে পাইলাম না।

আমরা ক্যাম্পে বাহির হইলাম। এবার আমরা বহু দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে গিয়াছিলাম, মাসাবধি অগ্রসর হইয়া অন্য পথে ফিরিবার সময়, পথের দূরবর্ত্তী এক গ্রামে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত উপদ্রব শুনিলাম। গ্রামবাসীগণ সশঙ্কিত হইয়াছে। প্রায় শতাবধি লোক ধ্বংশ করিয়াছে। অথচ কেহই সে ব্যাঘ্র বধ করিতে পারিতেছে না। ভাণ্ডারা হইতে ডেপুটি কমিশনর, পুলিস সাহেব, সকলেই সেই পথে আসিতেছেন শুনিলাম। মিঃ দত্ত সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁবু ঠিক করিয়া রাখিতে লোক পাঠাইলেন। আমরা সেই গ্রামের নিকট অপরাহ্নে উপস্থিত হইলাম। পথে আসিবার সময় আরও একটি বৃহৎ তাঁবু রহিয়াছে দেখিলাম, বুঝিলাম অন্য কেহ ক্যাম্পে আসিয়াছেন। তখন আর চাকরদের প্রশ্ন করিবার সময় ছিল না।

সন্ধ্যার সময় আমি একাকী সম্মুখের আম্র কাননে বসিয়াছিলাম। একটা সতরঞ্চ বিছাইয়া, তাহার উপর কয়েকখান বেত্রাসন রাখা হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় আমরা একত্রে উন্মুক্ত বাতাসেই বসিতাম। আমার হাতে কোনও কাজ ছিল না, একটা ইংরাজী মাসিক পত্রিকা লইয়া ছবি দেখিতেছিলাম। এমন সময় আমার নিকটে শুষ্ক পত্র মরমর করিয়া উঠিল, যেন কোন অপরিচিত পদশব্দ, আমি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখি, আমার সম্মুখে মিঃ সুধীর রায়। আমি বিস্মিত, আমার আর বাক্য সরিল না। তিনিও নির্ব্বাক্ হইয়া মন্ত্রাহতের ন্যায় সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথমে আমি ভাবিলাম স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু তিনি যখন কথা কহিলেন, তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন, তখন আমি সেই করস্পর্শে বুঝিলাম ইহা স্বপ্ন নহে। তিনি বিস্ময়ের কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি এখানে?"

আমিও বলিলাম, "আপনি কি করিয়া এখানে আসিলেন?"

তিনি বলিলেন, "আমি ক্যাম্পে আসিয়াছি, আজ মিঃ দত্ত এখানে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আপনি কি এখানেই থাকেন?"

আমি মৃদু কণ্ঠে বলিলাম, "হাঁ আমি মিসেস্ দত্তের নিকট থাকি।"

মিঃ রায় বলিলেন, "আপনাকে সহসা এরূপ ভাবে চমকিত করিয়া আমি অতিশয় লজ্জিত হইয়াছি। আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই, যে এরূপ ভাবে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন।"

তিনি সম্ভ্রমের সহিত মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিয়া মিঃ দত্তের তাঁবুর নিকট গমন করিলেন।

আমি যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম, কোথায় দার্জ্জিলিং আর কোথায় মধ্যভারতবর্ষ! যাঁহাকে ইহ জীবনে আর কখনও দেখিবার আশা করি নাই তাঁহাকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া আমি এত আশ্চর্য্য হইলাম যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ইহা অদৃষ্টের নিদারুণ উপহাস ভিন্ন কি হইতে পারে? আমি আমার দুরন্ত মনকে সংযত করিয়া সেই স্থানেই বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস্ দত্ত, মিঃ দত্ত ও মিঃ রায় সেই স্থানে আসিলেন। মিঃ দত্ত আসিয়াই বলিলেন, "মণিকা, ইনি আমাদের নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রায়, এস তোমার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দি।"

মিঃ রায় লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "ইতিপূর্ব্বে আমি মিস্ বসুর সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম।"

মিঃ দত্ত তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সত্য! কোথায়?"

মিসেস্ দত্ত সেই সময় এমন একটি কথার উত্থাপন করিলেন, যে আর সে প্রসঙ্গের আলোচনা হইল না।

সেই রাত্রে মিঃ দত্ত মিঃ রায়কে ডিনারে আহ্বান করিলেন।

আমি কি করিব? আমি মিসেস্ দত্তকে অনেক করিয়া বলিলাম, "আমার মিঃ রায়ের সাক্ষাতে বাহির হইতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়, আমি বাহির হইব না।"

মিসেস্ দত্ত ইহা শুনিয়া আমার প্রতি রাগ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার স্নেহের তুলনা নাই। তিনি আমায় যেমন বুঝিয়াছিলেন এমন কি আর কেহ বুঝিবে? আমি আর কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলাম না।

আমার অবস্থা কিরূপ হইল? জানিয়া শুনিয়া স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করার মত? না সম্মুখে মহাসমুদ্র, বুঝিবার ক্ষমতা নাই, পশ্চাতে ফিরিতে সাহস নাই। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম।

রাত্রভোজনের পর সকলে নানা কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন। অবশেষ মিঃ দত্ত ব্যাঘ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া মিঃ রায় বলিলেন, 'আমি সেই জন্যই ত এখানে আসিয়াছি। বাঘ ধরিবার সব জাল প্রস্তুত হইয়াছে। আপনি যাইবেন না?"

মিঃ দত্ত বলিলেন, "ও সব কাজ এখন আমার সাজে না।"

মিঃ রায় মিসেস্ দত্তকে বলিলেন, "আপনি দেখিতে যাইবেন? যদি যান ত আপনাদের জন্য একটু ভাল করিয়া 'মাচান' করিতে বলিব।

মিসেস্ দত্ত আমার প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি বল মণি, যাবে?"

আমি নিরুত্তরে রহিলাম দেখিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আপনি যদি কখনো না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা দেখিবার জিনিষ বটে, কিন্তু হয়ত আপনি খুব ভয় পাইবেন।"

আমি বলিলাম, "ভয় পাইব কেন, তবে—"

মিসেস্ দত্ত বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার যদি অসুবিধা না হয় ত আমরা যাইব।"

পরদিন আমাদের সকলের ব্যাঘ্র শীকার দেখিতে যাইবার কথা স্থির হইল।

মিঃ রায় উঠিয়া সকলের নিকট বিদায় লইলেন, সেই করস্পর্শে আমি যেন মন্ত্রাহত হইলাম। সেই মোহময় স্পর্শ যেন পুষ্পের সুবাসের মত আমার অন্তরে মিশিয়া গেল।

পরদিন আমরা খুব ব্যস্ত রহিলাম, সন্ধ্যার সময় সেই জঙ্গলে যাইবার কথা। বৈকালে আমরা আহারাদি করিয়া টঙ্গা আরোহণে বাহির হইলাম। সহর ছাড়াইয়া নির্জ্জন পথ দিয়া টঙ্গা চলিল, কি দুর্গম পথ, কখনো চড়া কখনো ঢালু। দুই পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী, তাহা যদিও অধিক উচ্চ নহে তথাপি দুর্গম, চারিদিকে বন শালবন। মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ঢালু প্রান্তরে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। সেই প্রস্তরের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার বন্য গাছে এক একটি ঝোপ হইয়াছে। দু'একটি ঝোপের নিকট হইতে বন্য শশক বাহির হইয়া সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া, দ্রুতগতিতে অন্য ঝোপের নিকট চলিয়া গেল।

আমরা ক্রমশঃ ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। মিঃ রায় আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা টঙ্গা হইতে নামিয়া, সেই নির্দ্দিষ্ট মাচানের নিকট উপস্থিত হইলাম। দুইটি পাশাপাশি বৃক্ষ, তার মাঝ খানে দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া একখান ছোট খাটিয়া ঝুলাইয়া দিয়াছিল। খাটিয়ায় উপরে একখানি পরিষ্কার চাদর বিছান ছিল। একটি কাঠের সিঁড়ির সাহায্যে আমরা উপরে উঠিলাম, উঠিবার সময় আমার খুব ভয় হইয়াছিল। আমাদের মাচানের অনতি দূরেই অন্য একটি মাচান ছিল, তাহা মিঃ দত্ত ও মিঃ রায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমাদের মাচানের নিকট একটি একটি করিয়া গর্দ্দভ জাতীয় অশ্বতর বাঁধা ছিল। আমাদের নিকট হইতে কিয়ৎদূরে অন্য একটি মাচানে কয়েকজন চাপরাশী ও চাকর ছিল। তাহাদের নিকট পানীয় জল ও কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য ছিল।

রাত্রি গভীর হইল, সেদিন কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথি। রাত্রি গভীর হইলে চন্দ্রের কিরণ সেই বনে প্রবেশ করিল। আমরা যে বৃক্ষে ছিলাম, তাহা এত ঘন যে তাহার ভিতর দিয়া চন্দ্রের কিরণ প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য! আমরা সম্মুখে ও নিম্নের সকল দ্রব্যই দেখিতে পাইতেছিলাম। সহসা পত্রের খস্ খস্ শব্দে আমি সভয়ে মিসেস্ দত্তের হাত ধরিয়া টানিলাম, তিনি আমায় অতি মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "ও বাঘ নয়"। যাহা হউক সে যে পশু হউক, ধীরে ধীরে অন্য পথে চলিয়া গেল। ক্রমে আমার একটু তন্দ্রা আসিল, সহসা মিসেস্ দত্ত বলিলেন "দেখ দেখ", আমি চাহিয়া দেখিলাম দূরে পর্ব্বতের গাত্র দিয়া ক্ষীণ নির্ঝরিণীর ধারা বহিতেছে, সেই স্থানে এক ভীষণাকৃতি ব্যাঘ্র জলপান করিতেছে। মিঃ রায় ও তাঁহার একজন অনুচর ধীরে ধীরে বৃক্ষের পাশ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সে ব্যাঘ্র চলিয়া গেল, তাঁহারা তাহাকে বধ করিতে পারিলেন না।

তাহার পর পুনরায় সকলে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা রাত্রি দুইটার সময় পুনরায় দুর হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিলাম, ক্রমে তাহা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এমন সময় অন্য দিক দিয়া আর একটি পশু আসিয়া সেই "গারা"র ঘোড়াটাকে আক্রমণ করিল। পরে জানিলাম সেটি নেকড়ে বাঘ। সে যখন সেই ঘোড়াটাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময় ভীষণ গর্জ্জনে একটি বাঘ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। উভয়ের গর্জ্জনে ও যুদ্ধে সেই বনভূমি কম্পিত হইতে লাগিল, এমন সময় বন্দুকের শব্দ হইল। আমি সে শব্দে ও ব্যাঘ্রদ্বয়ের যুদ্ধ দেখিয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম, দেখিলাম নেকড়ে বাঘটা দ্রুতবেগে ছুটিয়া গেল, চিতা বাঘটা লুটাইয়া গড়াইতে লাগিল, আবার একটা বন্দুকের শব্দ হইল, সে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে মিঃ রায়ের সঙ্কেতে তাঁহার চাপরাশী ও অনুচরেরা আসিয়া সে ব্যাঘ্রকে দুই খণ্ড বাঁশে বাঁধিয়া লইল। আমরাও ধীরে ধীরে মাচান হইতে নামিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। যদিও আমি ইহার পরে আরও অনেক বার শীকারে গিয়াছি, সেবার যেমন ভীত হইয়াছিলাম এমন কোন বারে হই নাই।

সে দিন গৃহে আসিয়া আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইল। আমি পীড়িত হইয়া কয়েক দিন শয্যাগত রহিলাম। সে সময় মিসেস্ দত্ত একটি ফুলদানীতে সুন্দর ফুল আনিয়া আমার শয্যাপার্শ্বে টিপায়ের উপর রাখিতেন। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মাসীমা, এ জঙ্গলে এমন ফুল কোথায় পাওয়া যায়?" তিনি বলিলেন আমাদের ফুল নহে, মিঃ রায়ের প্রত্যহ ডালি আসে, তিনিই আমাদের এই ফুল পাঠাইয়া দেন। আর তিনি প্রায় দুই বেলা আসিয়া তোমার সংবাদ লইতেছেন, কাল বলিতেছিলেন, "রোগশয্যার নিকট ফুলের মত এমন সুন্দর দ্রব্য আর নাই। ফুলের প্রতি চাহিলে মনে কেমন একটী স্বর্গীয় ভাব জাগিয়া উঠে।"

মাসীমা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি নীরবে শয্যাতলে মুখ লুকাইয়া ভাবিতে লাগিলাম। কি ভাবিলাম, ফুল সুন্দর, স্বর্গীয়? কিন্তু আমার হৃদয়পুষ্পের নিকট

কার স্বর্গীয় মুখ সর্ব্বদা ফুটিয়া আছে, আমি যেন কোন মতে তাহা ভুলিতে পারি না, পারিব না। তিনি হয় ত দয়া করিয়া আমার কথা ভাবিতেছেন, আমায় কত দুঃসাহসী ভাবিতেছেন, কত নির্লজ্জ ভাবিতেছেন, কিম্বা আমার হৃদয়ের স্রোতে তাঁহার হৃদয় টলিয়াছে বুঝি! না আমি আর সে কথা ভাবিব না। ভবিষ্যতে যদি দেখা হয় তাহা হইলে আর বেশী কথা পর্য্যন্ত কহিব না।

আমি চতুর্থ দিবসের অপরাহ্নে বাহিরে আসিলাম। আম্র বৃক্ষতলে সতরঞ্জ বিছাইয়া, তাহার উপর দুচারিটি বেত্রাসন সজ্জিত ছিল।

মিসেস্ দত্তের তখনো গৃহকর্ম্ম শেষ হয় নাই। মিঃ দত্ত কোনও গ্রামে কার্য্য দেখিতে গিয়াছিলেন। আমি একাকী আসিয়া বাহিরে বসিয়াছিলাম, সেই মেঘহীন নির্ম্মল নীল আকাশের প্রতি শূন্য মনে চাহিয়াছিলাম। এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া বলিল, "সাহেব সেলাম দিয়া।" আমি ফিরিয়া দেখি মিঃ রায় আসিতেছেন। তিনি আসিয়া আমায় মস্তক নত করিয়া নীরবে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছেন?" আমি বলিলাম "ভাল আছি।" তিনি বলিলেন, "শীকারে গিয়াই আপনি অসুস্থ হইয়াছেন।" আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "আর কখন ত যাই নাই, তদ্ভিন্ন আমার সাহসও বড় নাই"।

মিঃ দত্ত ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তিনি উঠিয়া মিঃ দত্তের নিকট অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহারা উভয়ে ব্যাঘ্র শীকারের কথায় মগ্ন হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পুরাণ-প্রসঙ্গ।

মেঘনাদ বধ ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মধুসূদন দত্ত "মেঘনাদ বধ" কাব্যে যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি, এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস কি বলিতেছেন শুনুন।

বীরবাহু নিধনের পর ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ মায়াযুদ্ধ করিতেছেন দেখিয়া লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন যে, "ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড়িয়া রাক্ষসকে বধ করা যা'ক্।" রাম বলিলেন যে, "একের অপরাধে অন্যে কেন মারি।" ব্রহ্ম অস্ত্র মারা হইবে না। ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণের এই সকল যুক্তি শুনিয়া যজ্ঞস্থানে চলিয়া গেলেন, সেখানে বিদ্যুৎজিহ্ব নামে এক মায়াবী রাক্ষসকে দিয়া এক মায়াসীতা নির্ম্মাণ করিয়া হনুমানাদির সম্মুখে সেই মায়াসীতাকে কাটিয়া ফেলিলেন। হনুমান তাহা দেখিয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া রামলক্ষ্মণকে সে কথা বলিল, শুনিয়া রামলক্ষ্মণও শোকাকুল হইলেন। অবশেষে বিভীষণ রহস্য ভেদ করিয়া দিলেন। এদিকে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। বিভীষণ বলিলেন যে, "ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শেষ করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলে সেদিন তার সঙ্গে কেহই আঁটিয়া উঠিবে না। অতএব লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে দিন, আমরা গিয়া ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া আসি।" এই বিপজ্জনক কার্য্যে লক্ষ্মণকে পাঠাইতে রাম অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু বিভীষণের আশ্বাস বাক্য শুনিয়া অবশেষে শঙ্কিত মনে লক্ষ্মণকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলেন। লক্ষ্মণ ও বিভীষণ কপিসৈন্য সহ যাত্রা করিলেন। হনুমানাদি বানরগণ প্রহরী রাক্ষসগণকে তাড়াইয়া দিয়া যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিল এবং যজ্ঞ নষ্ট করিতে লাগিল। বিভীষণের পরামর্শ মত হনুমান আকাশ-পথ রক্ষা করিতে লাগিল, নীল সূক্ষ্মরূপে পাতালে রহিল। লঙ্কার পথ আগুলিয়া রহিলেন স্বয়ং বিভীষণ, যেন কোন দিক দিয়া ইন্দ্রজিৎ পলাইতে না পারেন। এদিকে ইন্দ্রজিতের সম্মুখে লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ

হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের বাণবৃষ্টি দেখিয়া ভয় পাইয়া আকাশে উঠিলেন। আকাশপথে সারথি রথ চালাইতেছে দেখিয়া হনুমান ইন্দ্রজিতের রথে লাফাইয়া পড়িল এবং রথ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন ইন্দ্রজিতে ও হনুমানে আকাশপথে মল্লযুদ্ধ হইতে হইতে দুইজনে জড়াজড়ি করিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন। নীচে পড়িলেন ইন্দ্রজিৎ, তার উপরে হনুমান। হনুমান্ ইন্দ্রজিতের বুকে হাঁটু দিয়া গলা চাপিয়া ধরিয়া—

শীঘ্র আইস কপিগণ ডাকে হনুমান।
সবে মেলি মেঘনাদের বধহ পরাণ॥

অমনি ইন্দ্রজিৎ ঠেলিয়া উঠিয়া বানরগণের উপর বাণ বরিষণ করিতে লাগিলেন। কপিগণ বাণ খাইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রজিৎ লঙ্কায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। বিভীষণ বাধা দিলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন :—

ত্বরা করি দুষ্ট বেটার বধহ জীবন॥
বিভীষণ বচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান।
ইন্দ্রজিতের কাছে গেল পুরিয়া সন্ধান॥
দুজনে দেখিয়া বাণ যুড়ে দুই জনে।
দুজনে পড়িল ঢাকা দুজনের বাণে॥
চারি দিকে পড়ে বাণ নাহি লেখা যোখা।
দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥
লক্ষ্মণ অশক্ত হইল প্রহারের ঘায়।
ব্রহ্মা বলেন পুরন্দর করহ উপায়॥
ব্রহ্ম অস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান।
লক্ষ্মণে ব্রহ্ম অস্ত্র পূরিল সন্ধান॥
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান।
মেঘনাদের মাথা কাটি করে দুই খান॥
পড়িল যে মেঘনাদ সংগ্রাম ভিতরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে॥

রাবণ রাজা ইন্দ্রজিতের নিধন-সংবাদ শুনিয়া অনেক শোক করিলেন এবং নিজে সসৈন্যে যুদ্ধে সাজিলেন। রাবণের পরাক্রমে—

ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণ॥
বানর কটক পড়ে নাহি লেখা যোখা।
* * * * *
দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
শ্রীরাম রাবণে দোঁহে বাজে মহারণ॥
বাণাঘাতে রঘুবীর হৈলা অচেতন।
রামে পাছু করি আগু হইল লক্ষ্মণ॥

রাবণ লক্ষ্মণের উপর ময় দানবের শেল নিক্ষেপ করিলেন। শেলাঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাম রাবণে আবার যুদ্ধ বাধিল। সেই দিনই রামের হাতে রাবণ মরিতেন, কিন্তু লঙ্কার মধ্যে পলায়ন করিয়া বাঁচিলেন। এদিকে রাম যুদ্ধে জয় লাভের পর অবসর পাইয়া লক্ষ্মণের জন্য শোক করিতে লাগিলেন। সুষেণের পরামর্শমত হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনিতে যাত্রা করিল। রাবণ হনুমানকে ছলে মারিবার জন্য কালনেমীকে পাঠাইলেন। কালনেমী অনিচ্ছা স্বত্বেও গন্ধমাদন পর্ব্বতপ্রদেশে চলিয়া গেল। হনুমানের পূর্ব্বেই সেখানে গিয়া তপস্বীর বেশে বসিয়া রহিল। হনুমান সেখানে গেলে সমাদর করিয়া বসিতে বলিল। হনুমান বলিল, "আমার তাড়াতাড়ি, বসিতে পারিব না। আমাকে ঔষধ চিনাইয়া দিন্।" কালনেমী বলিল, "আচ্ছা তা হবে, তুমি এখন ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আইস। আমি অতিথিকে সৎকার না করিয়া ছাড়িতে পারিব না। তাহা হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে।" "হনুমান পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেল। জলে নামিবা-মাত্র এক প্রকাণ্ড কুমীর হনুমানকে চাপিয়া ধরিল। হনুমান কুমীরটাকে পুকুরের পাড়ে তুলিয়া মারিয়া ফেলিল। কুমীর তখন দিব্যদেহ ধারণ করিয়া বলিল, "আমি দেবকন্যা, মুনির অভিশাপে কুমীর হইয়াছিলাম। কালনেমী ভণ্ড তপস্বী সাজিয়া তোমাকে মারিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। এতএব সাবধান।" এই কথা বলিয়া দেবকন্যা আকাশ পথে চলিয়া গেল।

এদিকে কালনেমী হনুমানের বিলম্ব দেখিয়া মনে করিতেছিল যে হনু বুঝি কুমীরের হাতে মরিয়াছে, এমন সময় হনুমান গিয়া হাজির। হনুকে দেখিয়া কালনেমীর

আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। তখন হনুমান কালনেমীকে গালি দিল। কালনেমী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। হনুমান মল্ল যুদ্ধে কালনেমীকে বধ করিয়া তাহার মৃতদেহ টান মারিয়া লঙ্কার দিকে ফেলিয়া দিল। তখন রাবণ রাজা অন্ধকারে পাত্র মিত্র লইয়া সভা-গৃহে বসিয়াছিলেন। কালনেমীর মৃত দেহ পড়্‌বি ত পড়্‌ সেই রাবণের অন্ধকার সভা স্থলে। "কি পড়িল বলে সবে চমকিয়া উঠে। নেড়ে চেড়ে দেখে বলে কালনেমী বটে।" তখন রাবণ বুঝিলেন যে হনুমান ত সব মাটি করিল, ডাক্ দেবগণকে। অমনি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ হাজির। রাবণ সূর্য্যকে বলিলেন যে "সূর্য্য উদয় হইলেই লক্ষ্মণ মরিবে। অতএব তুমি এখনই উদয় হইতে যাও।" সূর্য্য বলিলেন, "তা কেমন করিয়া হইবে। এখন যে দুই প্রহর রাত্রি।" "তাতে কি ক্ষতি? তুমি বুঝি মনে মনে আমার অকুশল চিন্তা কর?" রাবণের কথায় ভীত হইয়া সূর্য্য আবার উদয় হইতে চলিয়া গেলেন। সূর্য্য গন্ধমাদন পর্ব্বত দিয়া রথারোহণে উদয় হইতে যাইতেছেন, হনুমান তখন ঔষধি-বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতেছিল। সূর্য্যকে দেখিয়া হনুমান বলিল, "প্রভু সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ। আপনি এখন উদয় হইতে যাইতেছেন কেন? এখনও রাত্রি আছে। আপনি উদয় হইলেই যে লক্ষ্মণ মরিবেন, আমি রামের সেবক হনুমান। আপনি ফিরিয়া যাউন।" সূর্য্য বলিলেন, "ওরে বাপ্‌রে, তা কি হয়? রাবণের হুকুমে আমি অসময়ে উদয় হইতে যাইতেছি। ইহার অন্যথা হইলে রাবণের হাতে অপমানের বাকী থাকিবে না। যাহাতে উভয় কুল রক্ষা হয় তাই কর।" হনুমান বলিল "সুন্দর যুক্তি ঠাওরাইয়াছি। আসুন কাণে কাণে বলি। আপনার নাম ভানু, আমার নাম হনু, আসুন দুজনে মিতালি করি।" হনুমানের নিকট সূর্য্য আসিবামাত্র—

সূর্য্যেরে ধরিয়া হনু করে কোলাকুলি।
সাপটিয়া সূর্য্যেরে পূরিল কক্ষতলি॥
মহা তেজোময় সূর্য্য রাখিতে কে পারে।
আপনি হইল বদ্ধ লক্ষ্মণের তরে॥

অতঃপর হনুমান ঔষধ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু পর্ব্বত ঔষধ লুকাইল। তখন হনুমান ডালেমূলে পর্ব্বত-শিখর একটানে উপাড়িয়া তাহা মাথায় করিয়া লইয়া চলিল। এক হস্তের কক্ষতলে সূর্য্য রহিলেন। এই অবস্থায় হনুমান মহাশব্দে আকাশ পথে চলিলেন। নন্দীগ্রামে শত্রুঘ্নের বাঁটুলাঘাতে 'জয় রাম' শব্দে ভূতলে পড়িলেন। ভরতের বাঁটুল খাইয়া পুনরায় আকাশে উঠিয়া লঙ্কা অভিমুখে চলিলেন। লঙ্কায় উপস্থিত হইলে, সুষেণ বৈদ্য ঔষধ চিনিয়া লইয়া লক্ষ্মণকে সুস্থ করিলেন। হনুমান পুনরায় পর্ব্বত-শিখর যথাস্থানে রাখিয়া আসিলেন। এতক্ষণ সূর্য্য হনুমানের কক্ষতলেই রহিয়াছেন। কাজেই রাত্রি আর প্রভাত হয় না। রাম হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমার শরীরে রবির কিরণ কেন?" হনুমান সূর্য্যদেবকে কক্ষে আবদ্ধ করিবার কথা কহিলেন। রাম বলিলেন, "আরে ছাড়ো ছাড়ো, ওঁকে ছাড়িয়া দাও। তাতেই এতক্ষণ রাত্রি প্রভাত হয় নাই।" হনুমান হস্ত উত্তোলন করিলেন। সূর্য্যদেবের মুক্তি হইল। রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণ সূর্য্যকে প্রণাম করিলেন। সূর্য্য উদয় হইতে গেলেন।

বাল্মীকির রামায়ণে এ সম্বন্ধে কি আছে দেখুন।

মকরাক্ষের নিধন-বার্ত্তা শুনিয়া রাবণ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে বাণদ্বারা ব্যথিত করিতে লাগিলেন। অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাম লক্ষ্মণকে তাহা করিতে দিলেন না। বলিলেন যে, "একজনের জন্য সকলকে বধ করা উচিত হয় না। মেঘনাদকে কোন প্রকারে দেখিতে পাইলেই আমরা উহাকে বধ করিব।"

ইন্দ্রজিৎ রামচন্দ্রের অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পুনরায় পুরী হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিম দ্বার আক্রমণ করিলেন। এবং নিজ বলে একটী মায়াসীতা স্থাপন পূর্ব্বক হনুমানাদি বানর-

গণের সম্মুখেই রোরুদ্যমানা মায়াসীতাকে বধ করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া হনুমানাদি বানরগণ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া রামকে সংবাদ দিতে গেল। রাম, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক সীতা নিহত হইয়াছেন শুনিয়া শোকে অতিশয় কাতর হইলেন। এই অবসরে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ সমাপন করিবার জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গমন করিলেন। বিভীষণ এই সংবাদ পাইয়া রামকে কহিলেন, "সীতাকে বধ করা ইন্দ্রজিতের সাধ্য নহে। তাহা অসম্ভব। আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিবার জন্যই ইন্দ্রজিৎ এই কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞান্তে যুদ্ধে প্রবেশ করিলে সে সকলের অজেয় হইবে। মায়াসীতা কাটিয়া সে আমাদিগকে ভুলাইয়াছে। অতএব আপনি শোক করিবেন না। আমরা তাহার হোম সমাপ্তির পূর্ব্বেই তাহাকে আক্রমণ করিব। আপনি সুলক্ষণ লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন। ইনি সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা তাহাকে সেই হোমকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেই সে আমাদের বধ্য হইবে। তখন রাম কহিলেন, "আমি সেই ভীষণ রাক্ষসের মায়ার বিষয় অবগত আছি। সেই বীর প্রাজ্ঞ, ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ, মায়াবী ও অত্যন্ত বলশালী। অতএব লক্ষ্মণ জাম্বুবান ও হনুমান প্রমুখ যূথপতি এবং ঋক্ষরাজ ও বানররাজ সুগ্রীবের সমগ্র সেনায় পরিবৃত হইয়া গমন কর। মহাত্মা বিভীষণ ইন্দ্রজিতের সমস্ত মায়াই জানেন। ইনি অমাত্যগণের সহিত তোমার পশ্চাৎ যাইবেন। রামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া পরমানান্দিত চিত্তে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভূমি নিকুম্ভিলার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহু সহস্র বানরে পরিবৃত হনুমান এবং অমাত্যের সহিত বিভীষণ অবিলম্বে তাঁহার অনুগামী হইলেন। বিভীষণের পরামর্শে বানরগণ অবিলম্বে রাক্ষস সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কেন না রাক্ষস-বল বিচ্ছিন্ন হইলে সেই স্থানেই রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎকে দেখা যাইবে। রাক্ষস-বানরে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এদিকে লক্ষ্মণও ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বানর ও ভল্লুকগণের পরাক্রমে রাক্ষসগণ ভীত হইতে লাগিল। এদিকে ইন্দ্রজিৎ শত্রুহস্তে নিজ সৈন্যকে পীড়িত দেখিয়া কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই উঠিলেন। এবং ক্রোধভরে বৃক্ষ গহন হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। এবং হনুমানের নিকট রথ চালাইবার জন্য সারথিকে আজ্ঞা করিলেন। সারথি রথ চালাইয়া দিল। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের রথের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে সমরে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের নিকট বিভীষণকে দেখিয়া পিতৃব্যকে কতকগুলি কটূক্তি করিলেন। বিভীষণও 'উত্তোর' গাহিলেন। লক্ষ্মণ হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রথারূঢ় ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রারম্ভে ইন্দ্রজিৎ দম্ভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে লক্ষ্মণ কহিলেন, "ওহে রাক্ষস, তুমি কেবল কথায় কঠিন কার্য্যের শেষ করিলে বটে, কিন্তু যিনি কার্য্য দ্বারা দুর্গম পারে গমন করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান্। কোন ব্যক্তিই যাহা করিতে পারে না তুমি নিকৃষ্ট হইয়াও কথাতে আমার পরাজয়রূপ সেই কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছ। তুমি তৎকালে রণমধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া যে কার্য্য করিয়াছ তাহা বীরগণের অনুমোদিত নয়, চৌরে সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ওহে রাক্ষস, বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? আমি যেমন তোমার বাণমুখে অবস্থান করিতেছি তেমনি তুমিও সম্মুখ রণে তোমার পরাক্রম দেখাও।" অতঃপর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়েই বলবান্, পরাক্রমশালী, দুর্জ্জয়, অতুল্য-বল ও অমিত তেজস্বী, পরস্পর যুদ্ধব্যাপৃত সেই বীরদ্বয় যুদ্ধ-নিরত বৃত্রাসুর ও ইন্দ্র এবং আকাশস্থিত গ্রহযুগলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের রথের ঘোড়া ও সারথি নিহত হইল। তখন ঘোর অন্ধকার। অন্ধকারেই ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই অন্ধকারের

সুবিধা পাইয়া ইন্দ্রজিৎ শত্রুর অলক্ষ্যে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তম রথারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও মহাবল বানরগণ, ইন্দ্রজিতের ক্ষিপ্রহস্ততার বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পুনরায় ভীষণ ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রঅস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্রজিতের কিরীটকুণ্ডলাবৃত সুচারু মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বানরগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ রামের নিকট ফিরিয়া গেলে তিনি যারপর নাই আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "সাধু লক্ষ্মণ! তোমার দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। ইন্দ্রজিৎ বধে আমাদের জয় অবধারিত। তিন দিন এবং তিন রাত্রে সেই বীরকে তোমরা নিপাতিত করিয়াছ। তোমরা আমাকে নিঃশত্রু করিয়াছ। একমাত্র রাবণ জীবিত আছে। সেও অদ্য যুদ্ধ করিতে আসিবে। রাবণ আজ যুদ্ধ করিতে আসিলে আমি তাহাকে নিশ্চয়ই বধ করিব। হে ইন্দ্রজিৎ-বিজয়িন্, তুমি যুদ্ধে আমার সহায় থাকিলে সীতা অথবা বসুমতী এ উভয়ের কিছুই দুর্লভ হইবে না।" রাম এই সকল কথা বলিয়া কীর্ত্তি-বর্দ্ধন ভ্রাতা লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং তিনি লজ্জিত হইলেও স্নেহবশতঃ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন।

ইন্দ্রজিতের নিধন-সংবাদ শ্রবণে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া অসংখ্য সৈন্যসহ রাবণ যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন। রামের সহিত রাবণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে লক্ষ্মণ সাতটি বাণদ্বারা রাবণের ধ্বজ কাটিলেন, এবং একটি বাণদ্বারা সারথির মস্তক দেহচ্যুত করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তাঁহার বিশাল ধনু কাটিয়া ফেলিলেন। সেই সময় বিভীষণ গদাঘাতে রাবণের রথের চারিটি ঘোড়া মারিয়া ফেলিলেন। রাবণ অশ্বশূন্য রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। এবং বিভীষণের উপর একটি প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ সেই শক্তিটী বাণদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে বীর্য্যশালিন্, তুমি রাক্ষস বিভীষণকে রক্ষা করিলে বটে, কিন্তু এইবার এই অমোঘ শক্তি তোমার উপর পড়িতেছে। পরিঘতুল্য আমার বাহু হইতে বিসৃষ্ট এই শত্রু-রুধিরপায়িনী শক্তি তোমার হৃদয় ভেদ করিয়া প্রাণ লইয়া নির্গত হইবে।" এই বলিয়া রাবণ সেই ময়-নির্ম্মিত অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি মহাবেগে নির্ভীক মহাদ্যুতি লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। রাবণের যোগবলে গাঢ়রূপে মগ্ন সেই শক্তিদ্বারা হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় লক্ষ্মণও ভূতলে পতিত হইলেন। মহাতেজস্বী সমীপস্থ রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সেইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহপ্রযুক্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করতঃ প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা রাবণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। রাবণ, ধনুর্দ্ধর মহাত্মা রামচন্দ্রের বাণজাল বর্ষণে বিকীর্ণ এবং পরিপীড়িত হইয়া ভয়ে বায়ু-বিতাড়িত মেঘের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

রাম, লক্ষ্মণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণনাশ হইয়াছে বিবেচনায় শোক করিতে লাগিলেন। সুষেণ বলিলেন, "লক্ষ্মণ এখনও জীবিত আছেন। হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে জাম্বমানকথিত ঔষধ আনিলেই লক্ষ্মণ সুস্থ হইবেন। হনুমান রাম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঔষধ আনিতে গমন করিলেন। হনুমান ঔষধ চিনিতে না পারিয়া ঔষধ-সমন্বিত গিরিশৃঙ্গ তুলিয়া আনিলেন। ঔষধ সেবনে লক্ষ্মণ চেতনা লাভ করিলেন এবং রাম নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। রামও সেই দিনকার যুদ্ধে রাবণকে বধ করিলেন।

বাল্মীকির রাম সর্ব্বগুণসমন্বিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিনি বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত,

সচ্চরিত্র, সকল প্রাণীর হিতৈষী, প্রজারঞ্জক, বিদ্বান্, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, অদ্বিতীয় প্রিয়-দর্শন, সংযত চিত্ত, জিতক্রোধ, দীপ্তিমান্, অসূয়াশূন্য এবং সমরক্ষেত্রে তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া সুরগণও শঙ্কিত হইতেন। লক্ষ্মণও রামের উপযুক্ত ভ্রাতা।

রাম লক্ষ্মণ তেজস্বিদিগের শ্রেষ্ঠ, বাল্মীকি তাঁহাদিগকে তদ্রূপই চিত্রিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ও মাইকেল মধুসূদন রাম লক্ষ্মণের কি নাকাল করিয়াছেন তাহা দেখান হইল। ইহাকেই বলে শিব গড়িতে বানর গড়া। কৃত্তিবাসের এরূপ করিবার কারণ যাহাই হউক না কেন, মধুসূদন সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে, যে বিজাতীয় পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া বিজাতীয় আদর্শের অবৈধ অনুকরণ করিতে গিয়াই তিনি আমাদের বহুকালের জাতীয় আদর্শগুলিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন।

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া আজ শেষ করিব। কথাটা হনুমানের কক্ষতলে সূর্য্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখা। "বগল ঝাড়িলে সূর্য্য" এই পরিহাস বাক্য কৃত্তিবাসের কৃপাতেই আমাদের দেশে চলিত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণে হনুমানের সহিত কোলাকুলির কথা নাই। কৃত্তিবাস স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন যে "নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি বচনে, বিস্তারিত লিখিল অদ্ভুত রামায়ণে।" হনুমানের সূর্য্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখারূপ অদ্ভুত কার্য্যের উল্লেখ অদ্ভুত রামায়ণ বা অন্য কোন পুরাণাদিতে আছে কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে বাল্মীকি রামায়ণের নিম্নলিখিত শ্লোকটিও উক্ত উপন্যাসের কারণ হইতে পারে ;—

"স ভাস্করাধ্বানমনুপ্রপন্ন
স্তং ভাস্করাভং শিখরং প্রগৃহ্য,
বভৌ তদা ভাস্কর সন্নিকাশো
রবেঃ সমীপে প্রতিভাস্করাভঃ।"

অর্থাৎ দিবাকরের ন্যায় রূপসম্পন্ন সেই বীর হনুমান সূর্য্যতুল্য পর্ব্বতশিখর গ্রহণপূর্ব্বক ভাস্কর-পথে উপস্থিত হইয়া ভাস্কর সমীপে প্রতিভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণাদি অচেতন হইলে জাম্ববানের কথামত হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনয়ন করিতে যান। ঔষধ চিনিতে না পারিয়া হনুমান সেই পর্ব্বত তুলিয়া মাথায় করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করেন। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে মহর্ষি বাল্মীকি হনুমানের তৎকালীন শোভা বর্ণনা করিয়াছেন। পরিহাসরসিক কথক মহাশয়েরা একটী শ্লোকে পাঁচবার সূর্য্যের উল্লেখ দেখিয়া হনু-ভানুর মিতালি পাতাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

মৃত্যু।

এ দেহ পিঞ্জর হতে
যবে উড়ে যাবে পাখী,
তুমি তারে ডে'কে নিবে
অমর ও দেশে থাকি।
সেথা নাহি দুঃখ শোক,
সেথা নাহি হাহাকার,
আঁধার নাহিক তথা
জীবনের চারি ধার।
সে দেশে রবে না আঁখি
আঁখির বিকার লয়ে,
শুধু সেথা রবে তুমি
শীতল অঞ্জন হ'য়ে।
আশায় নিরাশা বিষ
নীরব দীরঘ শ্বাস,
প্রভাতে সন্ধ্যায় তথা
বহে নাক বার মাস।
জীবন সংগ্রাম সেথা
বুঝিগো পশিতে নারে,
মৃত্যু নাম অবিনাশী
তোমার ও মুক্ত দ্বারে।

মুক্ত-দেহ আত্মা মোর
চির মুকতির পথে,
অনন্তে মিশিয়া যাবে
অমর লোকের সাথে।
উন্নতির পথে আসি
মৃত্যুর সোপান দিয়ে,
হে চির আনন্দ, শান্তি,
তোমাতে মিশিবে গিয়ে।
এ দেহ জরায়ু হতে
লভিব মুকতি তবে,
মোহের বিকার মোর
নীরবে খসিয়া যাবে।
আমি ধন্য হব মম
ধন্য হবে মনস্কাম,
শান্ত হব চির তরে
লভি চির শান্তি-ধাম।

সরলা দত্ত।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ।

বোম্বাই নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি যে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তাহার সুদ হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি (প্রেম-চাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি) প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত জজ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও যদুনাথ সরকার প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম ছাত্রগণ এই বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী ক্লরেন্স মেরী হলাণ্ড নাম্নী একটী মহিলাও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ভোগ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই বৃত্তির পরিমাণ দশ হাজার টাকা ছিল। কোম্পানীর কাগজের সুদ কমিয়া যাওয়ায় এখন সাত হাজার টাকা হইয়াছে। অর্থের সৎব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারে, দেশের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত যে অর্থ ব্যয় হয়ঃ তাহাই অর্থের সর্ব্বোত্তম ব্যবহার বলা যাইতে পারে।

কিন্তু শ্রীযুক্ত রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ কেবলমাত্র তাঁহার দানশীলতার জন্যই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। তাঁহার পুরুষকার সর্ব্বসাধারণের অনুকরণীয়। অবস্থাবৈগুণ্যে তিনি যখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অতুল ধনৈশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া দারিদ্র্যের কবলে পেষিত হইতে-ছিলেন, তখনও তিনি অবস্থার দাস না হইয়া স্বাবলম্বন বলে পুনরায় অবস্থার উন্নতির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হন, দরিদ্রতায় আক্রান্ত হইলে সাধারণতঃ তাঁহারা একবারে অভিভূত হইয়া পড়েন, সংসারে তাঁহাদের আর দাঁড়াইবার শক্তি থাকে না। কিন্তু প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ অবস্থার পরিবর্ত্তন গ্রাহ্য না করিয়া পুনরায় দীন দরিদ্রের ন্যায় সামান্য মূলধনে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যে প্রেমচাঁদ জুড়ীর গাড়ী না হইলে পথ চলিতেন না, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের কঠিন উত্তাপে পদব্রজে চলিয়া বা ট্রাম গাড়ী আরোহণে তিনি যথা তথা ভ্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কোন শারীরিক শ্রমই অপমানজনক মনে করিতেন না। তাঁহার এই প্রকার যত্ন ও শ্রমে পুনরায় তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। আমাদের এই অধঃপতিত দেশে শারীরিক শ্রম লোকে নিন্দনীয় মনে করে, কিন্তু অপমান নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও পরের চাকুরী করা সম্মানজনক বোধ করে। সৌভাগ্যক্রমে চাকুরী অপেক্ষা শারীরিক শ্রমের শ্রেষ্ঠতা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের স্বাবলম্বনপ্রিয়তা ও পুরুষকার তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই উৎসাহিত করিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজের সহানুভূতি—আমাদের যুবরাজ ভারত ভ্রমণ করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে এদেশের সকলেই পরম প্রীত হইয়াছেন। তিনিও বিলাতে গিয়া এ দেশবাসীর রাজ-ভক্তির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। এই অল্প দিনের ভ্রমণেই যুবরাজ এদেশের প্রকৃত অবস্থা অনেকটা বুঝিতে

পোর্টস্‌মাউথ বন্দরে অবতরণ।

পারিয়াছেন। তিনি বেশ বুঝিয়া গিয়াছেন, যে এদেশের ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণ এদেশবাসীর প্রতি আশানুরূপ সদ্ব্যবহার করেন না। ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজগণের ব্যবহার আরো সহানুভূতি পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তিনি ইংলণ্ডে গিয়া এক নিমন্ত্রণ সভায় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গে নারীর উচ্চশিক্ষা—এইবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন এবং সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা ও আমাদের লেখিকা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বি, এ, মহাশয়ার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী বাসন্তী মিত্র, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এফ, এ, পরীক্ষায় তেরটী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন—বঙ্গভাষার বিখ্যাত প্রবীণ সেবক পেন্সন প্রাপ্ত সবজজ, শ্রদ্ধেয়া "আলো ও ছায়া"-রচয়িত্রীর পিতা, শ্রদ্ধাস্পদ চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। "মহারাজা নন্দকুমার", "ঝান্সীর রাণী" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিয়া ইনি বঙ্গভাষার অঙ্গপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সাহিত্য চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ইনি ঈশ্বর বিশ্বাসী তেজস্বী সাধু পুরুষ ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষা একজন উৎকৃষ্ট সেবক ও বঙ্গদেশ একজন খাঁটি মানুষ হারাইলেন।

নূতন মুদ্রা—কিছু দিন পরেই এদেশে "এক-আনি" নামক নূতন মুদ্রা প্রচলিত হইবে। মুদ্রার আদর্শ প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, সম্রাটের অনুমোদন বাকী আছে। আমরা এই মুদ্রার প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম। ইহা নিকেল ধাতু নির্ম্মিত, ওজন ৬০ গ্রেইন। প্রতিকৃতি দৃষ্টেই সকলে বুঝিতে

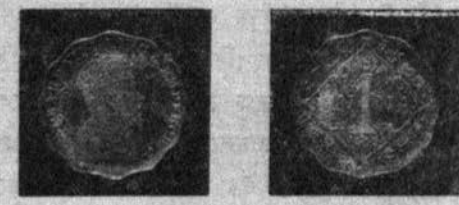

পারিবেন যে ইহার ধার তরঙ্গায়িত। এই মুদ্রা দ্রব করিতে কঠিন উত্তাপের প্রয়োজন, সুতরাং মেকি এক-আনি প্রস্তুত করা সহজ হইবে না। চুম্বকের আকর্ষণে রৌপ্য মুদ্রা আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু এই নূতন এক-আনি চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হইবে, সুতরাং জাল হইলে সহজে ধরিতে পারা যাইবে। সুইট্‌জার্লেণ্ড, অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্স ও ইটালি ব্যতীত অন্যত্র নিকেল মুদ্রার প্রচলন নাই।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

পরলোকগতা লেডি কার্জ্জন।

AKB/172 2 ১৫ কবি ২৪২ ৩৭-১৯০৬.

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

THE BENGAL LIBRARY 06, AUG 1906

১ম ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩১৩। | ১২শ সংখ্যা।

প্রাচীন ও নব্য ভারতে নারীজাতির অবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনুশীলন দ্বারা নারীর শক্তি কি পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে পারে, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষে নারীর শক্তি বিকাশের পক্ষে পদে পদে বিঘ্ন। স্বামী-মনোনয়নে হিন্দু বালিকার কোন মতামত নাই। যে অল্প বয়সে তাহাদের বিবাহ হয় তাহাতে তাহাদের মতামত গ্রহণ করা সম্ভবপরও নয়। কিন্তু এই অল্প বয়সে বিবাহ হইলেও, বিবাহ যে সকল গুরু দায়িত্ব আনয়ন করে তাহার হাত ইহারা অতিক্রম করিতে পারে না। বিবাহিত জীবনের গুরু কর্ত্তব্যভার বহন করিবার উপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ তাহারা পায় না। ইংরেজ নারীগণের কুমারী-জীবন তাঁহাদের নিকট কত মূল্যবান্। জীবনের এই সময়টুকুই আত্মোন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাল। বিচারশক্তি গঠিত ও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত করিবার এবং হৃদয়বৃত্তিগুলির সংযম শিক্ষার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়। কিন্তু এদেশে বালিকাগণ বিদ্যাশিক্ষারই সুযোগ পায় না, অন্য শিক্ষা ত দূরের কথা। এদেশে অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহিতা-বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে বটে, কিন্তু কুমারী-জীবনের শিক্ষা ও এই শিক্ষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। কুমারী-জীবনে বালিকারা শিক্ষার প্রচুর সময় পায়, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুসন্ধিৎসা সতেজ থাকে। বিবাহিত জীবনে এসকল সুবিধা থাকে না। এদেশে অল্পবয়স্ক যুবকগণও বিবাহ করিয়া পরিবারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়, অধ্যয়নে আশানুরূপ মনোনিবেশ করিতে পারে না। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত যোগ স্থাপিত হয় না। দুইটী জীবন যেন পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের অভিমুখীন। এদেশে অতি অল্প স্থলেই পত্নী উন্নত স্ত্রীধর্ম্ম পালনে ও জননী যথোপযুক্ত মাতৃ-কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হন। যখন বয়স বাড়িতে থাকে তখন তাঁহারা শক্তিহীনা, পর-গলগ্রহ ও কলহপ্রিয়া হইয়া উঠেন, সন্তানগণের প্রতি কর্ত্তব্য সমুচিতরূপে সম্পাদন করিতে পারেন না। সুতরাং হয় তাঁহারা সকল বিষয়ে উদাসীন

হইয়া পড়েন, নতুবা নীচতা ও স্বার্থপরতা দ্বারা সর্ব্বদা উৎপীড়িত হন।

পরিবারে নারীর অধীনতা আর একটী গুরুতর অকল্যাণের হেতু। বধূরূপে স্বামীর পরিবারে হিন্দু বালিকা যেরূপ উৎপীড়িত হয়, তাহাতে অনেক স্থলেই তাহার দেহ-মন ভগ্ন হইয়া পড়ে। পুত্রবধূ শাশুড়ীর ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ হইয়া থাকে, শাশুড়ীর মনে আবার ভয়, যদি বধূ পুত্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে, তবেই বিপদ। সুতরাং পুত্রের নিকট মাতা বধূর চরিত্র যথাসম্ভব মলিন করিয়া চিত্রিত করিতে কিছু মাত্র ত্রুটী করেন না। হিন্দু পরিবারের রীতি নীতি এমনই, যে সেখানে বধূর অভিযোগের কোনরূপ প্রতীকারেরই সম্ভাবনা নাই। কাজেই তাহার মন তিক্ত বিরক্ত হইয়া শেষে অপরাপর পরিপক্ক সঙ্গিনীদিগের ন্যায় অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এবং স্বীয় পুত্রের বিবাহের পর নিজে যখন শাশুড়ী হয় তখন আপন পুত্রবধূর উপর সুদে আসলে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ তোলে। যতই অল্পবয়স্কা, যতই বুদ্ধিহীনা হউন না কেন, পত্নীই গৃহের স্বাভাবিক অধিস্বামিনী। কিন্তু শাশুড়ীগণ এই অধিকারে সর্ব্বদাই হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে শাশুড়ীগণেরও কতকগুলি অধিকার আছে। পুত্রবধূগণ যদি অভয় দেন তবে শাশুড়ীগণের স্বপক্ষে দুই একটী কথা বলিতে পারি। তরুণী পুত্রবধূগণ অনেক সময়ই বুঝিতে পারেন না, যে তাঁহাদেরই স্বামীর কল্যাণ ও সুখ সাধনই শাশুড়ীগণের উদ্দেশ্য। পুত্রের বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাদের যে অধিকার ছিল, সেই অধিকারচ্যুত হইতে তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। ইউরোপে ও এদেশে যেখানেই গৃহে শাশুড়ীর কর্তৃত্ব সেখানেই প্রধানতঃ এই কারণ দেখা যায়। সদ্বুদ্ধি-শালিনী প্রত্যেক তরুণী বধূরই ধৈর্য্য সহকারে বয়স্কাদিগের উপদেশ শোনা উচিত।

তৎপর অবরোধ প্রথা। ক্রমে এই প্রথা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে এদেশে ইহা অতি কঠোর আকারে প্রচলিত ছিল। এই প্রথার সমর্থন-কারীগণ ইহার স্বপক্ষে শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কতকগুলি যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল অন্তরায় অতি সহজেই দূর করা যাইতে পারে। এই অবরোধ প্রথার জন্য নারীগণ সমাজে মিশিতে পারেন না এবং গৃহের বাহিরে সংসারের সংস্পর্শে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন। তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন বহির্জগতের বিচিত্রতা হইতে বঞ্চিত ও নিতান্ত সংকীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ, এজন্য তাঁহাদের আমোদ প্রমোদের একান্ত উপায়াভাব। সুতরাং সহজলভ্য পরালোচনা, পরনিন্দা ও অন্যান্য নিন্দনীয় উপায়ে তাঁহারা চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন।

হিন্দুনারীর উন্নতির আর এক অন্তরায় শিক্ষার অভাব। অল্পাধিক পরিমাণে পূর্ব্ববর্ণিত সামাজিক কুপ্রথাগুলিই এই অন্তরায়ের জনক। ভারত-নারীর সকল ত্রুটীর প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। স্বামীর উপর তাঁহার প্রভাবের অল্পতা, সমুচিতরূপে সন্তানপালনে ও সন্তানের শিক্ষাদানে অসমর্থতা, নানারূপ কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সর্ব্বদা মগ্ন থাকা ও অলঙ্কার-প্রিয়তা—প্রভৃতি দোষ-ত্রুটী এই শিক্ষার অভাব হইতেই উৎপন্ন। সুশিক্ষিতা, সুমার্জ্জিতা নারী অপেক্ষা অশিক্ষিতা রমণী পত্নীত্বের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত, কোন পুরুষ কি কখনও এরূপ মনে করেন? যে নারীর মন রন্ধনশালা ও সামান্য গৃহকর্ম্মের ঊর্দ্ধে বিচরণ করে না, পুরুষ কি পত্নীরূপে তাহাকে লাভ করিবার জন্য কখনও বিশেষ ব্যগ্র হন? নারীর জীবনে শ্রদ্ধার উপযোগী যথেষ্ট গুণ না থাকিলে কোন সৎপুরুষ কি তাহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতে পারেন? নিশ্চয়ই না। শিক্ষা লাভ করিলে স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইব, এই ভয়ে কোন নারীই যেন মানসিক উন্নতি সাধনে বিরত না হন। পত্নী স্ত্রীজনোচিত কোমল গুণাবলী হারাইবেন, এই ভয়ে কোন পুরুষেরও স্ত্রীকে জ্ঞানোন্নতি সাধনে বাধা দেওয়া উচিত নহে; কারণ প্রকৃত শিক্ষা নারীজনোচিত গুণরাশিকে বর্দ্ধিতই করে, কখন বিনষ্ট করে না। কিন্তু স্বাধীন ভাবে সমাজে মিশিয়া পুস্তকার্জ্জিত শিক্ষাকে পরিপুষ্ট না করিলে পুস্তকলব্ধ জ্ঞান জ্ঞানই নহে। এদেশের নারীগণকে স্বাধীন

ভাবে সমাজে মিশিতে দেওয়া উচিত, নতুবা তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি সম্যক পরিচালিত হইবে না। স্বামী ও স্ত্রী, পিতামাতা ও পুত্র-কন্যা এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের পরস্পরের সহিত উন্মুক্ত ভাবে মিশামিশি নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের উন্নতির পথে বিঘ্ন দেখিয়া আমরা নিরাশ হইব না, সাহস হারাইব না। সংগ্রামে—অবিরাম সংগ্রামেই জীবন। সংসারের লোকে কি বলিবে-না-বলিবে তাহার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া নারীর পক্ষে যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, তাহা করিতে আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কষ্ট সহ্য করা, পবিত্রতা ও সত্যের এবং নারীজাতির গৌরব ও সম্মান রক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়া, প্রত্যেক নারীরই অবশ্য-কর্ত্তব্য। বিধাতা তাঁহার অন্তরে যে শক্তির বীজ নিহিত করিয়া দিয়াছেন, ঈশ্বর ও মানব জাতির সেবার জন্য সেই শক্তির বিকাশ-সাধনে উদাসীন হওয়া নারীর পক্ষে কখনও উচিত নহে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন, "কি প্রণালীতে জীবন ধারণ করিব, ইহাই সর্ব্ব প্রধান প্রশ্ন। শুধু বাহ্য জীবন নহে, বিস্তৃততম অর্থে জীবন শব্দের প্রয়োগ করিতেছি। এই প্রকার পূর্ণজীবন যাপনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" সুতরাং আমরা সর্ব্বতোপ্রসারিণী পূর্ণ-শিক্ষা, বৈচিত্র্যময় জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগী সৎশিক্ষা—যে শিক্ষাতে শরীর মন ও আত্মা সংযমশীল ও শক্তিশালী হইবে—সেই শিক্ষা চাই।

হিন্দু নারীর উন্নতির সর্ব্বশেষ অন্তরায় বিধবাদিগকে বিবাহ না দেওয়া। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, ছোট ছোট বালিকাগণকে পিতার বয়সী পুরুষদিগের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। অনেক স্থলেই নিদারুণ বৈধব্য জিনিষটা কি তাহা বুঝিবার শক্তি জন্মিবার পূর্ব্বেই বালিকা বিধবা হয়। জীবন ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। প্রকাশ্যভাবে সকলে তাহার দুর্ভাগ্যকে নিন্দা ও তিরস্কার করে, পরিবারে যত বিপদ ঘটে তাহারই অশুভ অদৃষ্টে তাহা আরোপ করা হয়। তাহার অন্ধকারময় জীবনে একটিও আশার আলোক-রশ্মি দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু পরিবারে গৃহকর্ম্মে বিধবাগণ কত সাহায্য করেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই শ্রম তাঁহাদিগের দুঃখের মাত্রাকে একটুও হ্রাস করে না। সুখের বিষয় বিধবাদিগের শোচনীয় অবস্থার প্রতি লোকের দৃষ্টি একটু আকৃষ্ট হইয়াছে, আশা করি তাঁহাদের দুঃখভার ক্রমে লঘু হইবে। শুধু পুনর্বিবাহ দ্বারা তাঁহাদের জীবন উন্নত হইবে, তাহা বলিতেছি না, কারণ বিবাহই নারী-জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য নহে; স্বগৃহে তাঁহাদিগের অবস্থা উন্নত করিয়া, তাঁহাদের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যবহার করিয়া এবং তাঁহাদের সম্মুখে জীবনের উন্নত আদর্শ ও লক্ষ্য স্থাপন করিয়া, তাঁহাদিগকে উন্নত ও সুখী করিতে হইবে।

বাল্যবিবাহ দূর করিবার জন্য আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যেখানে তাহা সম্ভবপর নয় সেখানে অন্তঃপুরে বালিকা-পত্নীর শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা স্বামীর কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। কথা অনেক বলা হইয়াছে, কায অতি অল্পই হইতেছে। দোষ প্রধানতঃ পুরুষগণেরই,—কারণ তাঁহারা উপদেশ দেন অনেকে, দৃষ্টান্ত দেখান অল্প লোকে। কিন্তু আমাদেরও দোষ আছে। আমরা সকল কায়ের ভারই পুরুষদিগের উপর দিয়া রাখি, ইহাতে আমাদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষার দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পায়। আমাদিগকেও কায করিতে হইবে এবং পুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে, যে তাঁহাদিগের সহিত একই সোপানে আমাদিগকে স্থান দিতে তাঁহারা ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

কিন্তু অনেকে বলেন, এ সকল কথা বলা ত সহজ, কাযে করাই কঠিন। একথা যথার্থ। শত শত বৎসর হিন্দু নারীকে যে অবস্থায় বাস করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, যে সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে আর তাঁহাদের ইচ্ছা হয় না। বলিতে কষ্ট হয়—কিন্তু কথাটা সত্য, যে লেখা পড়া শিখিতেও তাঁহাদের অনেকে ইচ্ছা করেন না। এখন তবে উপায় কি? যে সকল সুযোগ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা

হয় তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। এবিষয়ে পুরুষদিগের সাহায্য প্রয়োজন। স্ত্রীজাতির প্রতি এদেশের পুরুষদিগের যে হেয় ধারণা আছে তাহা পরিবর্ত্তিত না হইলে পুরুষদিগের প্রকৃত সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। পুরুষগণ যদি নারীদিগকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের উপর আস্থা স্থাপন করেন তবে যে কত কল্যাণ হইতে পারে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বিবিধ উপায়ে শিক্ষালাভে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর উৎসাহের ন্যায় মূল্যবান আর কিছু নাই। লেখা পড়া শিক্ষা করা যে উচিত একথা স্ত্রীকে বুঝাইয়া দেওয়া স্বামীর কর্ত্তব্য। হিন্দু নারী স্বামীকে দেবতার ন্যায় মান্য করেন, তাঁহার অভিলাষ কত শ্রদ্ধার সহিত পূর্ণ করেন। সুতরাং স্বামী যদি স্ত্রীকে বলেন, যে লেখা পড়া শিক্ষা করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, এবং তিনি যদি ভাল ভাল পুস্তক পড়িয়া স্ত্রীকে শুনান তবে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্ত্রী নিশ্চয়ই বিদ্যাশিক্ষার জন্য কঠোর শ্রম করিবেন।

এখানে ইংরেজীশিক্ষা সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিব। দেশীয় ভাষার উন্নতির জন্য এখন অনেক চেষ্টা হইতেছে। দেশীয় ভাষায় স্ত্রী-পাঠ্য সাহিত্যের উন্নতি করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যত দিন ইংরেজ আমাদের রাজা, যত দিন আমাদের দেশে প্রচলিত উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে ইংরেজীর ভাগই অধিক থাকিবে, যত দিন বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা ইংরেজীতেই পরিচালিত হইবে, যত দিন এদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসীদিগের পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা ইংরেজীতেই নির্ব্বাহিত হইবে, তত দিন ইংরেজী আমাদিগকে শিক্ষা করিতেই হইবে। অবশ্যই দেশীয় ভাষার প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা প্রদর্শন করা হইবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের অনেক উপকার করিয়াছে, যদি তদ্দ্বারা আমরা আরো উপকৃত হইতে চাই তবে যে উপায়ে সহজে তাহার ফল লাভ করিতে পারি তাহাই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। সেই উপায় ইংরেজীভাষা শিক্ষা করা।

ইংরেজী শিক্ষাদ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইবে। এদেশের যুবকেরা সকলেই ইংরেজীতে শিক্ষা লাভ করিতেছেন, যদি তাঁহাদের মাতা, ভগ্নী এবং পত্নীরাও ইংরেজী জানেন তবে পরস্পরের সহিত চিন্তা ও ভাবের কত সহানুভূতি স্থাপিত হইতে পারে। কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা হইলে প্রকৃত সাহচর্য্য স্থাপিত হয়; এই সাহচর্য্যে অতি কঠিন কাযও সহজসাধ্য হয়; উভয়ের শিক্ষা সমতা লাভ করিলে পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান হইবে, এবং উভয়েরই সুবিধা ও উন্নতি হইবে, আমাদের সংকীর্ণ ধারণা সকল দূর হইবে, আমাদের চরিত্র সবলতর হইবে, এবং আমরা দেখিতে পাইব যে, যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম ও আমোদ প্রমোদ লইয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকি, জগতে আমাদের কর্ত্তব্য শুধু তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে; উন্নত জীবন লাভের জন্য আমাদের প্রাণে প্রকৃত ব্যাকুলতার সঞ্চার হইবে এবং তদুপযোগী সুযোগ ও উপায় আমরা আগ্রহের সহিত অবলম্বন করিব।

ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে হিন্দু নারীগণ তাঁহাদের সন্তানগণের সহিত সর্ব্বদাই যোগ রক্ষা করিতে পারিবেন, কারণ, স্বীয় শিক্ষা দ্বারা সন্তানদিগের স্কুলে যাইবার পূর্ব্বে ও পরে সকল সময়েই তাঁহারা তাহাদিগকে পাঠে সাহায্য করিতে পারিবেন।

ইংরেজী শিক্ষা আর একটা মহৎ উপকার সাধন করিবে। ইহা হিন্দু ও ইউরোপীয় মহিলাগণের মধ্যে মিশামিশি বৃদ্ধি করিবে; এই মিশামিশি দ্বারা আমরা অনেক শিখিতে পারিব। এখন উভয় পক্ষই মিশিবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু ভাষার পার্থক্য এই বিষয়ে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

ইংরেজী শিক্ষা করিলে গৃহকর্ম্ম সম্পাদনে নারীগণ বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে পারিবেন, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে অধিক মনোযোগিনী হইবেন এবং তাঁহাদের দৈনিক জীবন উচ্চতর চিন্তা ও ভাবে পূর্ণ থাকিবে।

সর্ব্বশেষ কথা এই যে, স্ত্রীশিক্ষা এদেশের সমাজসংস্কারের এক প্রধান অস্ত্রস্বরূপ হইবে। এক বার যদি পুরুষেরা আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন—যদি আমরা উপযুক্ত হই তবে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করিবেন—তাহা

হইলে অন্য দেশের রমণীগণ যে সকল সামাজিক অধিকার উপভোগ করিতেছেন, এদেশের পুরুষেরা আমাদিগকে তাহা দিতে বাধ্য হইবেন। সমাজ-সংস্কারকেরা যখন দেখিবেন যে, যাঁহারা সংস্কার-কার্য্যে তাঁহাদের প্রধান বিরোধী ছিলেন সেই নারীগণই দেশের ঘোর সামাজিক অন্ধকার দূর করিতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাঁহারা দ্বিগুণ আশা ও উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। দেশের মহা অনিষ্টকারী অসংখ্য কুপ্রথা দূর হইবে, দেশে নূতন শক্তির সঞ্চার হইবে।

এদেশের নারীগণ তাঁহাদের প্রাচীন মহৎ গুণগুলি একবারেই হারাইয়াছেন, এরূপ মনে করা ঠিক নহে। গার্হস্থ্য সদ্‌গুণ, স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা, লজ্জাশীলতা ও দয়া সর্ব্বদাই তাঁহাদের চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিতেছে এবং এখনও এদেশের নারীদিগের মধ্যে মাঝে মাঝে নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষতার আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে এখনও এদেশের নারীগণ কতক পরিমাণে স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছেন, অনেক স্থলে তাঁহারা স্বামীর শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন, প্রকাশ্য স্থলে প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহাদের প্রতি প্রচুর সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সকল বিশেষ বিশেষ বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও এদেশের নারীদিগের উন্নতির জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লোকের মনে নিতান্ত কুসংস্কার ছিল; স্ত্রীলোকগণ শিক্ষা লাভ করিলে তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খলা আনয়ন করিবেন, অনেকেরই এরূপ ভয় হইয়াছিল। এই ভয় এখন ভীত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টান্তে ও খৃষ্টান মিশনারী-দিগের চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে লোকের কুসংস্কার ধীরে ধীরে দূর হইতেছে। এখন শুধু পুরুষগণ নয়, স্ত্রীলোকগণও স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেছেন। দেশে অনেক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং হিন্দু মাতাগণ আনন্দের সহিত কন্যাগণকে এই সকল বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন। ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্বামীগণও উপযুক্ত সঙ্গিনী করিবার ইচ্ছায় বিবাহের পরেও নারীগণের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাদিগকে এখন অধিক স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। আত্মোন্নতির জন্য নারীগণ নানা স্থানে সভাসমিতি স্থাপন করিতেছেন। অনেক স্থানে বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতেছে। এদেশের নারীগণের এই সকল উন্নতি-চেষ্টা দেখিয়া আশা হইতেছে যে, তাঁহারা ও চিরে তাঁহাদের ইউরোপীয় ভগ্নীগণের ন্যায় সমাজে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন। দারুণ কুসংস্কার ক্রমে সম্পূর্ণ পরাজিত হইবে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় জীবনের সাহায্যকারিণী, সঙ্গিনী ও পরামর্শদায়িনী-রূপে নারীগণকে সম্মান করিতে শিক্ষা করিবেন, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আশা হইতেছে ভারত-নারী তাঁহাদের প্রাচীন স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন এবং বর্ত্তমান যুগের উন্নত প্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করিবেন এবং অদূর ভবিষ্যতে সমাজে তাঁহাদের প্রকৃত স্থান অধিকার করিয়া এদেশবাসীর চরিত্রকে কোমল, সবল ও মহত্তর করিতে সমর্থ হইবেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন পুরুষদিগের উপর হিন্দুনারীর কোনরূপ প্রভাব নাই। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় যে তাঁহাদের উন্নত ভাব সমূহ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না তাহার কারণ নারীরই বিরুদ্ধ-প্রভাব। নারীগণ প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করিতে চাহেন না, কোন পুরুষ সেই সকল প্রথা অতিক্রম করিতে চাহিলে তাহাকে নারী-গণের নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং হিন্দু-পত্নী স্বামীর সহায় না হইয়া এখন তাহার পথে বাধাস্বরূপমাত্র। বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুনারী স্বামীর প্রতি প্রকৃত সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য ও সন্তানের প্রতি প্রকৃত মাতৃকর্ত্তব্য সাধন—এই দুইটী প্রধান কর্ত্তব্য পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। কিন্তু তাঁহার অবস্থা যদি উন্নত হয়, চতুষ্পার্শ্বের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার মত শক্তি যদি তাঁহাতে সঞ্চার করিতে পারা যায়, তবে তিনি এসকল কর্ত্তব্য সাধনে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। হিন্দু নারীর মানসিক উন্নতি সাধন

করিলে তাঁহারাও তাঁহাদের ইউরোপীয় ও আমেরিকান্ ভগ্নীগণের ন্যায় স্বদেশের সেবা করিতে সমর্থ হইবেন।

সুতরাং ভারতনারীর অবস্থার উন্নতি সাধনে এখন এদেশের পুরুষগণের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। নারীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এদেশের উন্নতিশীল সভ্যতার পথে দারুণ কণ্টকস্বরূপ। এদেশের নারীদিগকে বিদ্যা শিক্ষাদানই তাঁহাদের প্রতি পুরুষগণের এখন প্রধান কর্ত্তব্য। পুরুষগণের অনুরূপ শিক্ষাই নারীগণকে দেওয়া উচিত। ইংরেজ জাতির গৃহ আরাম ও সুখের জন্য সর্ব্বত্র বিদিত, কারণ ইংরেজ পরিবারে নারীর প্রভাব সর্ব্বোপরি; নারী সেই গৃহের সম্রাজ্ঞী। এই জন্যই ইংরেজপুরুষ জগতের যথা তথা ভ্রমণ করুন না কেন, গৃহের সুকোমল স্মৃতিপূর্ণ তাঁহার মন, জীবনের সর্ব্ব প্রকার দুঃখময় ঝঞ্ঝাবাতে নিরাপদ আশ্রয় স্থান রূপে জীবনপথের আলোক রশ্মিরূপে সর্ব্বদা আপনার গৃহের পানেই তাকাইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডেও নারীর উন্নতি সহজে সাধিত হয় নাই। তজ্জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। আমাদেরও নিরাশ হইবার কারণ নাই। উপযুক্তরূপ চেষ্টা করিলে আমরাও আমাদের পশ্চিম দেশীয় ভগ্নীগণের ন্যায় উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইব। ইংরেজ-কবি টেনিসনের সহিত আমরাও বলিতেছি;—

বরষ বরষ ধরি হবে অগ্রসর
নরনারী সমতার পথে,
নরের পৌরুষ লভি নারী পূর্ণতর—
সগৌরবে যাবে তাঁর সাথে।
কোমল মধুরতর নারীর প্রকৃতি
লভি নর হবে বিকশিত,
বীণা-তন্ত্রী সুরে যেন কলকণ্ঠ গীতি
মিলি প্রাণ করিবে মোহিত।
মিলনের খরস্রোতে প্রকৃতি পুরুষ
উন্নতি-সাগর পানে ধায়,
কল্যাণ মঙ্গল যত করি বিতরণ
কালরূপ সাগর-বেলায়।
তখন আসিবে নামি স্বরগ হইতে
ধরা মাঝে নন্দন-কানন,
স্বর্গীয় উদ্বাহ যত শান্ত সুপবিত্র
তখনিত হবে অনুষ্ঠান।
বর্দ্ধমান ভাবী বংশ লভিয়া জনম
ধরাপৃষ্ঠ করিবে মহান্,
তোমার আশীষে দেব, এহেন সুদিন
আসুক আসুক ভগবান্!

পরিচিত।

১

জগতের অনাদৃত জগতের কাছে
সবিনয়ে মাগিছে বিদায়,
আর সে চাহে না তাহা চাহিতে বা' আছে
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সমুদায়।

২

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তারে যে মহা পীড়নে
পীড়িয়াছে বহু যুগ ধরি,
ত্বরায় করুণ মৃত্যু স্নেহের মিলনে
সে যাতনা দি'ক দূর করি।

৩

আসিত বরষা যবে ভাসিত আকাশে
নব নীল নীরদের মালা,
অবনী ভাসায়ে দিত প্রেমের উচ্ছ্বাসে
দামিনী করিত রূপে আলা।

৪

তার দেশ—মরুময় বালুকা প্রান্তর
না পড়িত এক ফোঁটা জল,
বসুধার তপ্ত দেহে সে অনল-স্তর
কভু নাহি হইত শীতল।

৫

বসন্ত আসিত যবে শ্যামল ছটায়
চারু কান্তি বিশ্ববিমোহন,
হাসিত কুসুম মালা তরু লতিকায়
বহিত মলয় সমীরণ।

৬

আলাপিত কলকণ্ঠ গুঞ্জরিত অলি
ভবে নব জীবন সঞ্চার,
সে অভাগা তার শুধু নিদাঘ কেবলি
বিশ্বভরা উষ্ণ হাহাকার।

৭

সকলের তরে আছে স্নেহার্দ্র হৃদয়
রোগ শোকে মধুর সান্ত্বনা,
অভাগার 'পরে সারা ব্রহ্মাণ্ড নিদয়
নাহি তার অণু রেণু কণা।

৮

আছে গৃহ—অট্টালিকা অথবা কুটীর
জগতের প্রতি জন তরে,
তাহারি আশ্রয় শুধু জাহ্নবীর তীর
যদি মা করুণা কভু করে।

৯

জগত তাহারে ভাবে অমঙ্গল গ্রহ
হায়রে জীবন্ত ধূমকেতু,
আপনার ভার তার দারুণ দুঃসহ
সে জীবন অনর্থের হেতু।

১০

তবুও কি স্নেহময়ি! এখনো চাহিছ
সেই অভাগার পরিচয় ?—
এত দিন জানা শুনা তবু না জানিছ—
আমি সেই, আর কেহ নয়।

শ্রীবীর-কুমার-বধ-রচয়িত্রী।

সুমিত্রা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুমার সেন কাশ্মীরে চলিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে যে পলাতক বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি রটিবে, তাহা অতি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন। তবে কুমার সেনের মহৎ হৃদয়, তাঁহার মনের ধৈর্য্য ও অন্তরের বলও অসাধারণ। তাই যখন সুমিত্রা কহিলেন,—

"ভাই বোন, কি পবিত্র সম্বন্ধ দোঁহার,
বিধির স্বহস্তে গড়া আজন্ম বন্ধন।
তার চেয়ে বেশি হল খ্যাতি ও অখ্যাতি,
কেবল মুখের কথা ক্ষুদ্র নিন্দুকের ?
এযে চির জীবনের প্রাণের সম্পর্ক—
পিতা মাতা বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদে
ঘেরা পুণ্য-স্নেহ-তীর্থ ;—

তখন কুমার সেন অখ্যাতিকে অগ্রাহ্য করিয়া সৈন্যসহ কাশ্মীরে উপনীত হইলেন।

এদিকে বিক্রমদেব কুমার সেনকে পলাতক মনে করিয়া তাঁহার পিতৃরাজ্য কাশ্মীরে তাঁহাকে ধরিবার জন্য গমন করিলেন। তখন কুমার সেন নিরুপায় হইয়া যুদ্ধের জন্য মনকে প্রস্তুত করিলেন, মনস্বিনী সুমিত্রাও তাহাতে বাধা দিলেন না। কিন্তু কুমার সেনের পিতৃব্য-পত্নী সময় বুঝিয়া তাঁহার স্বার্থ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলেন। তিনি তাঁহার স্বামীকে কুপরামর্শ দিলেন। কহিলেন "বিক্রমদেব যুদ্ধ করিতে আসিতেছে, সে ত ভালই ; তুমি তার জন্য কেন যুদ্ধ-সজ্জা করিবে ? তাহাকে সমাদর করিয়া রাজ্যে ডাকিয়া আন, সে কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করুক, কুমারকে বন্দী করুক। তার পর তুমি বন্ধুভাবে তাহার নিকট হইতে কাশ্মীরের সিংহাসন চাহিয়া লইও। তাহা হইলে কুমার সেনের এ সিংহাসনের উপর আর কোন দাবী দাওয়া থাকিবে না।"

কুমার সেনের পিতৃব্য তাহাই করিলেন। তখন কুমার সেন বিক্রমদেবের হস্তে বন্দী না হইয়া পলায়ন করিলেন। রাজ্যের সমস্ত প্রজা তাঁহার মহত্বে মন্ত্রমুগ্ধ ছিল। প্রজাগণ অরণ্যের মধ্যে কুমার সেনকে লুকাইয়া রাখিল।

এই অরণ্যের মধ্যে কুমার সেন ও সুমিত্রা যে ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন, তাহা পাঠ করিলে একদিকে যেমন অশ্রুজলে নয়ন আর্দ্র হইয়া যায়, অন্যদিকে তাঁহার প্রতি সামান্য কাঠুরিয়াদিগের ভক্তি

শ্রদ্ধা এবং তাঁহার জন্য তাহাদের আত্মত্যাগ ও স্বার্থ-ত্যাগের কাহিনী পাঠ করিয়া অবাক হইতে হয়।

অতঃপর বিক্রমদেবের দুর্দ্দান্ত অনুচরগণ পশুভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কাশ্মীরের প্রজাগণ কুমার সেনকে লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহাদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। কুমার সেনের ছিন্ন মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিল। তখন কি আর কুমার সেন স্থির থাকিতে পারেন? কিন্তু কি করিবেন, এই সকল দুর্দ্দান্ত হিংস্র পশুতুল্য অনুচরদিগের হস্তে ধরা দিয়াও কোন লাভ নাই। একাকী যুদ্ধের কল্পনা করা, আর ধরা দেওয়া সে ত একই কথা। কাজেই তিনি যেমন বীর তেমনি বীরের ন্যায়ই ইহার প্রতিকারের কল্পনা করিলেন।

কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা বিক্রমদেবের পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়া রাখি। বিক্রমদেব একদিন কাশ্মীরের রাণী রেবতীর জঘন্য হিংসা প্রবৃত্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন। ভাবিলেন, এই হিংসা-বিষ ত আমাকেও জর্জ্জরিত করিয়াছে। এ বিষকে আর হৃদয়ে স্থান দেওয়া হইবে না।

ইহার পর তিনি কুমারের অন্বেষণে ত্রিচূড় রাজ্যে গমন করিলেন। ত্রিচূড়ের রাজা অমরুরাজ। অমরুরাজের কন্যা ইলা। ইলার সঙ্গে কুমার সেনের বিবাহ স্থির হইয়াছে।

এই ইলার চিত্র বড়ই সুন্দর হইয়াছে; এই একটি চিত্রে সমগ্র কাব্যখানি সুমধুর হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহাদের কাব্যরস গ্রহণ করিবার কোন শক্তি নাই, তাঁহারাও ইলার প্রাণস্পর্শী কাহিনী পাঠ করিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারিবেন না। ইলা-চরিত্র রচনায় রবীন্দ্র বাবু আশ্চর্য্য কল্পনা-নৈপুণ্য ও কাব্য কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। যতই ইলা-চরিত্র আলোচনা করি, ততই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেন কচি কিশলয়ের কোমলতা, সুষম কুসুমের মাধুরী ও স্বর্গের কোনও দেববালার প্রেম এবং পবিত্রতা সংগ্রহ করিয়া এই অনুপম চিত্রখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাকে দেখিয়াই রাজা বিক্রমদেব বলিয়াছিলেন;—

"একি অপরূপ মূর্ত্তি! নিরখিয়া চরিতার্থ আমি!"

ইলার কাহিনী পাঠ করিতে করিতে তাহার অপার্থিব মূর্ত্তি যখন পাঠকের হৃদয়ের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া পাঠককেও বলিতে হয়,—

"একি অপরূপ মূর্ত্তি! নিরখিয়া চরিতার্থ আমি!"

বলিতে কি, ইলার করুণ ও মধুর প্রকৃতি, ইলার করুণ ও মধুর বাক্য, ইলার করুণ ও মধুর সঙ্গীত, ইলার সরল হৃদয়ের সবল বিশ্বাস, ইলার নিষ্কাম চিত্তের অতুলনীয় প্রীতি, পাঠকের মনকে এমন করুণ ও মধুর ভাবে পূর্ণ করিয়া তোলে যে, গ্রন্থখানি পড়া হইয়া গেলেও ইলাকে ভুলিতে পারা যায় না; তাহার বিষাদমাখা স্মৃতি যেন অন্তরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকে।

যা হোক, রাজা বিক্রমদেব ইলার অপরূপ মূর্ত্তি, অনুপম সরলতা এবং সেই সরল হৃদয়ের বলিষ্ঠ প্রেম ও আত্মত্যাগের অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কহিলেন,—

"কি প্রবল প্রেম? ভালবাস' ভালবাস'
এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালবাস!
প্রেম-স্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই!"

তারপর কুমার সেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে! এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টি সম; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মত। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ দেশান্তরে, স্কন্ধে ব'হে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ!
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেম শিশির শীতল!
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ি, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্ত-কলুষিত!"

রাজা স্থির করিলেন, কুমার সেনকে ধরিবেন এবং বন্দী করিবেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরণে লৌহশৃঙ্খল না পরাইয়া প্রীতির শৃঙ্খল পরাইবেন;—খুব জাঁক জমক ও আনন্দোৎসবের সহিত কুমার সেন ও ইলার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন এবং কুমারকে তাঁহার পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

বিক্রমদেব ইলাকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরে আসিলেন। ইতিমধ্যে কুমার খবর পাঠাইলেন, তিনি স্বয়ংই ধরা দিবেন। তখন বিক্রমদেব তাঁহার বিবাহোৎসবের আয়োজন করিলেন। কিন্তু কুমার সেন কি ভাবে ধরা দিলেন? এখন সেই কথাই বলি। তিনি সুমিত্রাকে কহিলেন,

"আর ত সহে না।
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।"

সুমি। মোরা দুইজনে যাই রাজসভা মাঝে;
দেখিব কেমনে, কোন্ ছলে জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব!

কুমার। "পিতৃ সিংহাসনে
বসি বিদেশী রাজা, দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি—একি সহ্য হবে?
অনেক সয়েছি বোন্, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে?

সুমি। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

এতদিন পরে সুমিত্রার এই কথা দেবতার আদেশ-বাণীর ন্যায় কুমার সেনের হৃদয়ে যেন অমর সঙ্গীত তুলিয়া দিল। কুমার সেন কহিলেন,—

"বল, বোন, বল 'তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল!' এই ত তোমার যোগ্য কথা।
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল! ভাল করে' ভেবে
দেখ! বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল! বল
একি সত্য নয়? থেকো না নীরব হয়ে,
বিষাদ আনত নেত্রে চেয়োনা ভূতলে।
* * *
* * আমি রাজপুত্র,
আমার কর্ত্তব্য প্রজাদের রক্ষা করা।
ছারখার হয়ে যায় সোণার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন
প্রজা,—কেঁদে মরে পতিপুত্রহীনা নারী।
তবু আমি কোন মতে বাঁচিব গোপনে?"

সুমি। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

ইহার পর সুমিত্রা কর্ত্তব্যের কঠিন বজ্র দ্বারা তাঁহার কুসুম-সুকুমার রমণী-হৃদয়কে প্রস্তরবৎ কঠোর করিলেন। কুমার সেনের আদেশে একজন অনুচর তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। রাণী স্বর্ণথালায় সেই ছিন্ন শির লইয়া রাজার সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন,—

"ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে, কান্তারে, শৈলে, দয়া, ধর্ম্ম, রাজ্য,
রাজলক্ষ্মী সব ভুলে'; যার লাগি দশ-
দিকে হাহাকার করেছ প্রচার; যারে
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে, এই
লহ মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শির; আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হো'ক্, শান্তি হো'ক্
এ জগতে নিবে যাক্ নরকাগ্নি রাশি,
সুখী হও তুমি! (ঊর্দ্ধস্বরে) মাগো, জগত জননী,
দয়াময়ি, স্থান দাও কোলে!"

রাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন: তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন রাজা নতজানু হইয়া কহিলেন,—

"দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জ্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহ জন্ম
নিত্য অশ্রু জলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!"

এইখানেই গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইল। কিন্তু সমাপ্ত হইলেও ঠিক এই স্থানটিতেই, এই বিয়োগান্ত কাব্যখানি

পাঠকের হৃদয় এক অভিনব উদাস ভাবে পূর্ণ করিয়া, পাঠককে অশ্রুজলে ভাসাইয়া, পাঠকের নিভৃত মর্ম্ম স্থানে এমন এক বেদনা জাগাইয়া দেয়, যে ইহার প্রায় সমস্ত ঘটনা পাঠকের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে কবির প্রতিও পাঠকের একটি স্থায়ী শ্রদ্ধার ভাব জন্মে। বোধ হয় কোন উৎকৃষ্ট কাব্য রচনার ইহাই চরম সার্থকতা।

আমরা এখন সুমিত্রা-চরিত্রের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়াই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

কাব্যরসজ্ঞ কবিগণ বলিয়াছেন "প্রেমই রমণীর অমূল্য ভূষণ।" একথা অতি সত্য। রমণীর সুকুমার দেহলতা মধুর লাবণ্যে রমণীয় হইলেই ত শুধু রমণীকে সুন্দর বলা যায় না। রমণী সুন্দর হয় পবিত্র প্রেমে। অরুণের তরুণ রশ্মিমালা যেমন উষার আকাশকে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করে, প্রভাতের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি যেমন তরুলতাকে সুশোভিত করে, তেমনি নির্ম্মল প্রীতি নারী-হৃদয়কে সুন্দর ও মধুর করিয়া তোলে।

কিন্তু এই প্রেমেরও সীমা আছে। এই প্রেম যখন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সংযমের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া, হৃদয়ের লক্ষ্য ও জীবনের কর্ত্তব্যকে ডুবাইয়া দেয়, বিনাশ করে—তখন সেই উচ্ছৃঙ্খল ভাবরাশিকে আর যথার্থ প্রেম বলা যায় না, তখন তাহাকে আসক্তি, মোহ বা এই রকমই কোন একটা নামে অভিহিত করা কর্ত্তব্য।

আমরা অগ্রেই বলিয়াছি, রাজা বিক্রমদেবের প্রেম এই জাতীয়। কিন্তু রাণী সুমিত্রার প্রেম এই জাতীয় নহে। প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ কি? প্রেমকে যদি নারী হৃদয়ের ফুল বলা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, প্রেমাস্পদের জন্য স্বার্থত্যাগে ও আত্মবিসর্জ্জনেই সে ফুলের সৌরভ ও সুষমা। যে ফুলের সুষমা ও সুগন্ধ নাই, সে ফুলের আদরও নাই; তেমনি যে প্রেমে স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জন নাই, সে প্রেমের গৌরব কোথায়? যে নারী মধুলোভী ভ্রমরের ন্যায় প্রেমাস্পদের নিকট শুধু আদরটুকু, যত্নটুকু, মিষ্ট কথার রসটুকুই পাইতে চাহে, কিন্তু তাহার জন্য কিছু করিতে পারে না, কিছু ছাড়িতে চাহে না, সে নারীর প্রেম কি প্রেম?

সুমিত্রার মহৎ হৃদয়ে যথার্থ প্রেম ছিল। সেই জন্য শুধু তিনি রাজার যত্ন, আদর ও মিষ্ট কথার মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। তিনি রাজাকে যথার্থ ভালবাসিতেন, তাই নিজের সুখ তুচ্ছ করিয়া, বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজার কার্য্যে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, এবং সেই আত্মবিসর্জ্জনের জন্যই আপনার জীবনকেও বিসর্জ্জন দিতে হইল। এইখানেই ত সুমিত্রার প্রকৃত মহত্ত্ব! প্রেমের যে কি মহত্ত্ব, তাহা রবীন্দ্রনাথ যেমন আঁকিয়া দেখাইতে পারেন, বুঝি বা বাঙ্গালা সাহিত্যে তেমনটি আর কেহই পারেন না। আমরা 'রাজা ও রাণী' হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে দেখাইতেছি, রাজার প্রতি রাণীর প্রেম কি সুগভীর এবং প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জ্জনের ভাব কি সুমহান্!

আমরা 'রাজা ও রাণী' গ্রন্থের মধ্যে রাণীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া প্রথমেই দেখিতে পাই, তিনি শুধু রাণী নহেন, তিনি গৃহিণী। তিনি কেবল রত্নালঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া স্বর্ণ-সিংহাসনেরই শোভা বর্দ্ধন করেন না, গৃহকর্ম্মেও তাহার যথেষ্ট মনোযোগ। এ দেশের ধনাঢ্য পরিবারের রমণীদিগের ইহা একটি শিখিবার বিষয়। আমরা স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন-চরিতে পড়িয়াছি, তিনি তাঁহার কন্যাদিগকে রান্না-বান্না ও ঘর-কন্নায়ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন। রাণী সুমিত্রাকেও দেখিতেছি, তিনি গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন।

কিন্তু রাজা ত তাহা একেবারেই পছন্দ করেন না। তিনি বলিলেন,

"থাক্ গৃহ, গৃহ কাজ।
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি।"

সুমিত্রা বলিলেন;—

"কেবল অন্তরে তব? নহে, নাথ, নহে;
রাজন্! তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে।
অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী॥"

এখানে কথা ত সবে মাত্র তিনটি পংক্তি; কিন্তু কবি

তাঁহার কল্পনা-রাজ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমন কয়টি কথা বসাইয়া দিয়াছেন যে, রাণীর চিত্রখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রাণী কি স্ত্রৈণ পুরুষের স্ত্রীর ন্যায় শুধুই রাজার অন্তর অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন? তাহা ত নয়। তিনি যথার্থ রাজমহিষী হইয়া রাজার সমস্ত কার্য্যের সাহায্য করিতে চাহেন।

ইহার পর যতই কাব্যখানি পাঠ করা যায় ততই রাণীর মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রাজার প্রতি সুমিত্রার কতই ভালবাসা, তাঁহার অন্তরাত্মা ভালবাসা পাইবার জন্য কতই ব্যাকুল! কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসা দিতে গিয়া রাজা রাজকার্য্য ভুলিয়া যান, সেই জন্য রাণী বলিলেন,—

"শোন প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী, আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশি নই; আমারে দিও না লাজ;
আমারে বেসো না ভাল রাজশ্রীর চেয়ে!"

রাজা। চাহ না আমারে?

রাণী। কিছু চাই নাথ;
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

নিষ্কাম নারীহৃদয়ের কি অনুপম চিত্র! রমণীর মন যদি যথার্থই এইরূপ মহৎ না হইত, তাহা হইলে সংসার কি এত সুখের হইত? প্রতিদিন নারী আপনার সুখ শান্তিকে তুচ্ছ করিয়া স্বামীর জন্য, সন্তানের জন্য বিন্দু বিন্দু করিয়া দেহ ক্ষয় করিতেছেন, তাই ত আমাদের গৃহ পরিবারে এত সুখ, এত শৃঙ্খলা! রবীন্দ্র নাথ সুমিত্রাকে বাস্তবিকই ভারত মহিলার আদর্শ করিয়া তুলিয়াছেন।

রাজা কিন্তু যতই সুমিত্রার মহত্ত্বের পরিচয় পাইতে লাগিলেন, ততই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া সুমিত্রাকেই তাঁহার সমগ্র হৃদয় অর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, সুমিত্রা কহিলেন,—

"যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা,
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু!"

রাজা বিরক্ত হইলেন। রাজার বিরক্তি দেখিয়া রাণী কহিলেন,—

"ঘৃণা কর মহারাজ, ঘৃণা কর মোরে
সেও ভাল—একবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়—ক্ষুদ্র এ নারীর 'পরে
করিও না বিসর্জ্জন সমস্ত পৌরুষ!"

আর কত উদ্ধৃত করিব? যে সাধ্বী রমণী স্বামীর কল্যাণের জন্য তাহার পরম লোভনীয় পতি-প্রেমকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া, পতির ঘৃণা অবহেলা সহ্য করিতে প্রস্তুত হয়, তাহার মনের বল কত, তাহার প্রেমের শক্তি কতখানি, তাহার আত্মত্যাগের মূল্য কি, কে তাহা নিরূপণ করিবে?

কিন্তু এই খানেই ত রাণীর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত শেষ হয় নাই; রাজ্যের কল্যাণের জন্য, প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য রাণীর গৃহত্যাগেই আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। রাণী যখন ভায়ের সঙ্গে অরণ্যে বাস করিতেছিলেন এবং দারুণ ক্লেশ পাইতেছিলেন, তখন রাজার বন্ধু দেবদত্ত আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "তাঁরে মনে ক'রে, মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা!" বাস্তবিকই পতিব্রতা সুমিত্রার করুণ কাহিনী পড়িতে পড়িতে সীতার কথাই মনে পড়ে। শ্রীরামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাদেবীকে বনে পাঠাইয়াছিলেন; সুমিত্রা প্রজাদিগের কল্যাণের জন্য নিজেই ইচ্ছা করিয়া গৃহত্যাগিনী, বনবাসিনী এবং পতি-প্রেমে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন।

রাণী সুমিত্রার হৃদয়ে বজ্র এবং কুসুমের সমাবেশ হইয়াছিল; তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের কোমলতা ও কর্ত্তব্যের কঠোরতা পাশাপাশি শোভা পাইত। সেই জন্য রাজা তাঁহার ভালবাসায় একটু সন্দেহ করিলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন, আবার তিনিই রাজার কর্ত্তব্য-বিমুখ অসংযত প্রেম দেখিয়া বলিতেন,—

"মহারাজ,
এখন সময় নয়, আসিয়ো না কাছে;"

রাণীর প্রকৃতিতে কোমলতা ছিল বলিয়াই প্রজাদিগের

দুঃখে তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সামান্যা নারী হইলে হয় ত প্রজাদিগের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াই, তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করিতেন। সুমিত্রা কি শুধুই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ক্ষান্ত হইলেন? তিনি দুঃখী প্রজাদিগের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া প্রথমে রাজাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা যখন কিছুই করিলেন না, তখন তিনিই আপন নারী-হৃদয়ের মহিমা অনুভব করিয়া প্রকৃত রাণীর ন্যায় প্রজাদিগকে বলিয়া উঠিলেন,—

"ওরে বৎস, মাতৃহীন
নস্ তোরা কেহ, আমি আছি, আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রাণী, জননী তোদের!"

প্রথম যেমন সুমিত্রার প্রেমের মহত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছি, এখানে তেমনি তাঁহার যথার্থ রাণী হওয়ার সার্থকতা দেখিতে পাইতেছি।

রাণীর ভায়ের প্রতি যে তাঁহার কি শ্রদ্ধা, কি গভীর ভালবাসা তাহা আগেই বলিয়াছি। রাণী যখন রাজ্যের মঙ্গলের জন্য পুরুষের বেশে গৃহের বাহির হইলেন, তখন মন্দিরে দেবীর নিকটে দাঁড়াইয়া যে স্তুতিটী করিয়াছিলেন পাঠক পাঠিকাগণকে তাহা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। রাণীর সেই মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা পাঠ করিয়া কিছুতেই অশ্রু সংবরণ করা যায় না। কবি যেন রাণীর ব্যথাভরা হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মর্ম্মের কথা সকল পাঠ করিয়াছেন, এবং বাছিয়া বাছিয়া তাহারই কতগুলি কথা গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেই জন্য রাণীর এই উক্তি এতই হৃদয়গ্রাহী!

আমরা দেখিয়াছি, সুমিত্রা জালন্ধর নৃপতির মহিষী হইয়াও বিলাসিনী নহেন; তিনি গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকেন। স্বামীর অগাধ ভালবাসা তাঁহার অতি স্পৃহণীয় পদার্থ; তথাপি তিনি রাজার ও রাজ্যের কল্যাণের জন্য, ইচ্ছায়ই সে প্রীতি হইতে বঞ্চিতা হন। কিন্তু সে প্রেম সংযমের দ্বারা শাসিত, সে প্রেম কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দ্বারা নিয়মিত, সে প্রেম নিষ্কাম, সে প্রেম এত উচ্চ যে, রাণী সেই প্রেমের শক্তিতেই তেজস্বিনী; সেই প্রেমের বলেই দুঃখী প্রজাকুলের মাতৃ-স্বরূপিণী, সেই প্রেমের বলেই আত্মত্যাগে সর্ব্বদা কৃতসংকল্পা।

আমরা ইহাও দেখিলাম, তিনি ভক্তিমতী নারী; তিনি সরল বিশ্বাসের সঙ্গে আরাধ্যা দেবীর নিকট আপনার মনোবেদনা ব্যক্ত করেন, তাঁহার নিকট আপনার "রমণী হৃদয় বলি দিতে" প্রস্তুত হন!

আমরা জানি না এদেশের মহিলাদিগের মধ্যে সুমিত্রা-চরিত্রের কতটা আদর হইয়াছে; যদি না হইয়া থাকে, তবে তাহা লেখার দোষ নয়, পাঠিকাদিগেরই দুর্ভাগ্য। আমাদের বিশ্বাস, এই প্রেমরত্ন-ভূষিতা, গৃহকর্ম্মানুরাগিণী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, পতিব্রতা, প্রজাবৎসলা, আত্মত্যাগে কৃত-সংকল্পা সম্রাজ্ঞীর মহিমামণ্ডিত মনোমুগ্ধকর কাহিনী পাঠ করিয়া ভারত-মহিলার পাঠিকাগণ উপকৃত হইবেন; সেই জন্যই সুমিত্রা-চরিত্র আলোচনা করিলাম।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

রুশরাজ্যে প্রজাশক্তির জয়লাভ।

যথেচ্ছাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর রুশীয় জনসাধারণ অবশেষে স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিয়াছে। রুশ প্রজাগণ এ বিষয়ে এতকাল সমগ্র সভ্য জগতের পশ্চাতে পড়িয়াছিল, দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন ও অপরাজেয় অধ্যবসায় বলে, রাজশক্তির অত্যাচারে সহস্র সহস্র নরনারী প্রাণ সমর্পণ করিয়া এতদিনে রুশ-প্রজা বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছে। রুশ-সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ প্রজাসাধারণের এই প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য কোন উপায়ই অননুষ্ঠিত রাখেন নাই। সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, তখন সম্রাট দেখিলেন, হয় প্রজা সাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইবে, নতুবা রাজ্য ও প্রাণ উভয়ই বিসর্জ্জন করিতে হইবে। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রুশরাজ্যে পার্লেমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় সম্মতি প্রদান করিতে হইল। গত মার্চ্চমাসে রুশরাজ্যে প্রথম পার্লেমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রজা সাধারণের ৪৫০ জন প্রতিনিধি এই মহাসভায়

ডুমার অধিবেশন-মন্দির।

উপস্থিত হইয়া রাজ্যের কল্যাণোদ্দেশ্যে বিবিধ বিষয় আলোচনা করিতেছেন। সুবিস্তৃত রুশ সাম্রাজ্যে নানা জাতির বাস। বল্গা নদীর পূর্ব্ব তীর হইতে মুশলমান মুল্লা ও তাতার বণিকগণ, পোলণ্ড, লিথুনিয়া ও ভলিনিয়া প্রদেশ হইতে পোলিস, লিথুনীয় ও ভলিনীয়গণ, বল্টিক প্রদেশ হইতে লেট্‌গণ, নীপার উপত্যকা হইতে দুর্দ্ধর্ষ কসাক-বৃন্দগণ, নানা স্থান হইতে য়িহুদীগণ, সাধারণ রুশীয় কৃষকগণ ও অত্যাচারী অভিজাতবর্গ জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে এই মহাসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। বিবিধ শ্রেণীর প্রতিনিধিগণের সম্মিলনে সভা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

রুশিয়ার ইতিহাসে এই পার্লেমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। যে সকল জাতি রাজশক্তির অত্যাচারে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া রহিয়াছে, রুশিয়ার এই পার্লেমেণ্ট-প্রতিষ্ঠা তাহাদের অন্তরে নবোৎসাহ সঞ্চার করিবে। প্রজাসাধারণ চিরদিন যথেচ্ছাচারী রাজশক্তির অধীন হইয়া থাকিবে, ইহা কখনই বিধাতার অভিপ্রায় নহে।

রুশীয় ভাষায় এই পার্লেমেণ্টের নাম "ডুমা।" যথাবিধি ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর ডুমা প্রতিষ্ঠাকালে রুশ সম্রাট সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে সম্বোধন করিয়া নিম্নোদ্ধৃত বক্তৃতা করেন।

"এই পিতৃভূমির শাসন-ভার সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। রাজবিধি প্রণয়নে সাহায্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহারই ইঙ্গিতে প্রজাকুলের প্রতিনিধিবর্গকে আমি এখানে আহ্বান করিয়াছি। রুশিয়ার ভবিষ্যৎ মঙ্গল বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করিয়া আমার প্রিয় প্রজাদিগের প্রতিনিধিরূপে আমি আমার রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। অতি কঠিন ও জটিল কর্ম্মভার আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, জন্মভূমির প্রবল মঙ্গল কামনা আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে, আপনাদের মধ্যে সকল মতবৈষম্য দূর করিবে। * * * আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে ঈশ্বর আমাকে, মন্ত্রী সভাকে এবং এই ডুমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, অদ্যকার দিন যেন রুশিয়ার ভবিষ্যৎ শক্তি কাশের সূচনা স্বরূপ হয়। যে কার্য্য করিতে আমি পনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, আপনারা সেই কার্য্য ধনে প্রবৃত্ত হউন।"

সম্রাটের বক্তৃতার পর সেক্রেটরী অব ষ্টেট ডুমার ারম্ভ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে এবং প্রতিনিধি মণ্ডলীর অনুমোদনে মস্কো নগরবাসী অধ্যক্ষ রোম্‌জেব ডুমার সভাপতি মনোনীত হইলেন। সভাপতি স্বীয় আসন গ্রহণ করিয়াই রাজকর্ম্মচারীগণকে মহাসভার গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। রুশরাজ্যে যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল তাহাই ঘটিল। অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীগণই এতদিন প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বময় প্রভু ছিল, অদ্য রাজকর্ম্মচারীগণকে প্রজাকুলের প্রতিনিধির আদেশ পালন করিতে হইল।

ডুমার সভ্যগণ প্রবল উৎসাহে রাজ্যের কল্যাণের জন্য অনেক বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছেন, কিন্তু প্রায় প্রতিপদে সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গের সহিত ডুমার মত-বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। সম্ভবতঃ ডুমার ক্ষমতা আরো কিছুকাল রাজশক্তিদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ডুমা যে জয়লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

প্রেম-রহস্য।

কবি বলেন, যাহা সুন্দর মনোহর, মানুষ তাই ভালবাসে। শৈশবে চন্দ্রমার প্রতি আমাদের অকপট ভালবাসার ঐ কারণ। শিশু ফুল ভালবাসে, যেহেতু ফুল অতি সুন্দর। এই নিয়ম অনুসারে যাবতীয় উপন্যাসের নায়িকাই "সুন্দরী" হইতে বাধ্য হইয়াছে। নহিলে নায়িকা প্রথমে দর্শকের নয়নরঞ্জন, অতঃপর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থা হইতে পারে না।

বলি, যদি কেহ ঐ নিয়ম ভঙ্গ করে?—অর্থাৎ যদি কোন কুৎসিত বিশ্রী বস্তুকে ভালবাসে, তবে কি সে কবিসমাজের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে? তা যদি হয়, হউক। প্রেমিক প্রাণ দিতে কাতর নহে।

প্রেম কি? এই রহস্য অতি বড় পণ্ডিতেরাও ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই, আর তুমি আমি কোন্ ছার? তবে আমি এখন জীবনবর্ত্মের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া এই সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের বহুদর্শিতায় প্রেম সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বুঝিলাম যে, ও রহস্য দুর্ভেদ্য! যিনি প্রেম সম্বন্ধে কোনরূপ বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত 'অন্ধের হস্তী দর্শনের' ন্যায়!—অন্ততঃ আমার ধারণা ঐরূপ!

এস্থলে আমার জীবনের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমি হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান—সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই ভাল বাসিয়াছি। আমি বালিকা, প্রৌঢ়া, প্রাচীনা—সকল বয়সের লোককেই ভাল বাসিয়াছি। কিন্তু কেন ভাল বাসিয়াছি, তাহা আজি পর্য্যন্ত বুঝি নাই।

আমি কয়েক মাস আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরার নিকট

উড়িষ্যায় ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তথায় গিয়াছিলাম। উড়িষ্যার লোকেরা বড় ভীরু প্রকৃতির। আমাদের বাঙ্গালার ত্রিসীমায় (বিশেষতঃ আমার ভগ্নীপতির উপস্থিতি সময়) কেহ আসিত না। আসিত কেবল এক জন! প্রেমিকের অগম্য কোন স্থান নাই—প্রেমিককে গিরি লঙ্ঘন করিতে হয়, বিনা নৌকায় দুস্তর সাগর পার হইতে হয়, কত কি করিতে হয়,—আর এ "হাকিম বাবুর" বাসাবাটীর নিকট আগমন ত সামান্য ব্যাপার!

প্রত্যূষে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইলে দেখিতাম একটি বালিকা আমাদের বাঙ্গালার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে! আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম; ঘুরিয়া ফিরিয়া যখনই বারান্দায় আসিতাম, দেখিতাম সেই চক্ষু দুটির দৃষ্টি আমার প্রতি!

আমার ভগ্নীপতি আফিসে গেলে পর মধ্যাহ্নে যখন আমরা দুই ভগিনী অলস সময় কাটাইবার জন্য কোনরূপ বুনন গাঁথন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতাম, অথবা যখন গল্প করিতে করিতে দিদি তক্তপোষের উপর ঘুমাইয়া পড়িতেন, আর আমি কোন পুস্তক পাঠে রত থাকিতাম, কবিতার ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাহ্য জগৎ ভুলিয়া থাকিতাম,—সেই সময় দৈবাৎ মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতাম, জানালার নিকট বাহিরে দাঁড়াইয়া চম্পা (সেই বালিকা) আমাকেই দেখিতেছে।

একদিন কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন আসিস্?"

চম্পা নত মস্তকে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "তোম্‌হঙ্কু দেখিবাকু" (তোমাকে দেখিতে)। বলিয়াই আবার শঙ্কিতা হইল; সভয়ে আমার মুখ দেখিতে লাগিল। আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বালিকা পলায়ন করিল। বলা বাহুল্য চম্পার কথা শুনিয়া আমার মনে যারপর—নাই আনন্দ হইল। আমাকে সে প্রতিদিন দেখিতে আইসে ভাবিয়া কেমন একটু অহঙ্কারও অনুভব করিলাম! মানব হৃদয় বুঝি চিরদিনই প্রেম-ভিখারী, তাই (যদিও আমার স্নেহময় আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না তবু) এ অযাচিত প্রেমলাভে, কাঙ্গালের ধন-রত্নলাভে আহ্লাদিত ও গর্ব্বিত হওয়ার ন্যায়, আমিও অতিশয় পুলকিত হইলাম।

সময় সময় দেখিতাম আমাদের ঝী চাকরেরা চম্পাকে তাড়া দিয়া বলিত, "এখানে রোজ কি কর্ত্তে আসিস্?" সে বিনীত ভাবে উত্তর দিত, "টকে তাহাঙ্কু দেখি যাই" (তাঁহাকে একটু দেখে যাই)। একদিন আয়া তাহাকে অতি কর্কশস্বরে আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই চম্পা চলিয়া গেল। আমার বড় দুঃখ হইল। আয়াকে তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করায় সে বলিল, "ও যে জাতে চাঁড়াল, ওর ছায়া মাড়া'তে নেই।" তাহার ছায়া মাড়াইলে আয়াকে স্নান করিতে হইত! চম্পা অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া আমি তাহাকে হৃদয়চ্যুত করিতে পারি নাই! সে সুন্দরী ছিল না, বরং অতি কাল কুৎসিত ছিল; তবু আমি তাহাকে দেখিলে সুখী হইতাম।

আমাদের এই বিমল বিশুদ্ধ ভালবাসা লইয়া দিদিরা আমোদ করিতেন। দিদির এক প্রৌঢ়া ননদ সেখানে ছিলেন; তিনিও আমাদিগকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিতেন। তিনি বলিতেন "তাহেরা (আমি) চম্পার সহিত আবার মধু-মাস (Honeymoon) যাপন করিতেছে!" সে সময় আমার বিবাহিত জীবনের সপ্তম বৎসর ছিল।

সুখের দিন অস্থায়ী। রবিবারে দুলা-ভাই (আমার ভগ্নীপতিকে আমি আশৈশব দুলা-ভাই বলিয়া ডাকিতাম) আমাদের কক্ষে আসিয়া বসিলেন। আমাদের তিন জনকে অর্থাৎ দিদি, দিদির ননদ ও আমাকে কাপড় সেলাই লইয়া ব্যস্ত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমারও কিছু করা উচিত।"

দিদি তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন, "মাফ্ কর, আমাদের ছুঁচ কাঁচি নিয়ে টানাটানি করে' কাজ নাই!"

দুলা-ভাই। কেন আমি কি তোমাদের চেয়ে

আনাড়ী? তাহেরা সে দিন আমায় "য়্যাহু" বলেছিল, তাই বলে কি আমি সত্যই য়্যাহু হয়ে গেলাম?

দিদির ননদ। ডীন, জে, সুইফ্‌টের কল্পনা যে একেবারে সৃষ্টিছাড়া;—হুহনহুম্ দেশে অশ্বজাতি রাজত্ব করে, আর মানুষ (য়্যাহু) তাদের অধীনে থেকে শকটবহন করে!! ঈশ্! কল্পনার আর সীমা নাই!

দিদি। অশ্ব মানুষের উপর প্রভুত্ব করে, এটা আর বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় কি, দিদি? আমাদের সত্যিকার জগতে তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা চিরকাল ঘ'টে আস্‌ছে।

দুলা-ভাই। বটে? সে অদ্ভুত ব্যাপার কি?

দিদি। সে অদ্ভুত ব্যাপার এই, যে পুরুষেরা আবহমানকাল পৃথিবীতে আধিপত্য কর্‌ছে, যৎকালে সৃষ্টি জগতের উৎকৃষ্টতমা জীব নারীজাতি তাদের দাসত্ব-শকট বহন করে' থাকে!

সহসা একটা উত্তর যোগাইতে না পারিয়া দুলা-ভাই দিদির দিকে 'কটমট' দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমরা উচ্চ হাস্য করিলাম।

"আমি তোমাদের কর্ম্মশালার কিছু স্পর্শ করিব না—আমি আমার কাজ করি", এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে চুরুট দেশলাই বাহির করিলেন। ধূমপান করাটাও একটা মস্ত কাজ কি না!

দুলা-ভাই চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চম্পাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সকৌতুকে বলিলেন, "কি ছুঁড়ি! তোর নাম কি?" তৎক্ষণাৎ চম্পা পলায়ন করিল! দিদি বলিয়া উঠিলেন, —"আঃ! ওকে তাড়ালে কেন, ওযে তাহেরার সখী!"

এই কথায় একটা হাস্য-তরঙ্গ উঠিল, দুলা-ভাই আমার স্বামীকে দয়ার পাত্র বলিয়া আক্ষেপও করিলেন!

পরদিন চম্পা আর আসিল না। স্বয়ং "হাকিম বাবু" (দুলা-ভাই "বাবু" শব্দে আপত্তি করিতেন, কিন্তু গ্রামের লোকেরা কোন মতেই তাঁহাকে 'বাবু' বলিতে ছাড়িত না! "সাহেব" শব্দ শিখাইয়া দিলে "সাহেব বাবু" বলিত।) তাহাকে দেখিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাই তাহার ভয়ের কারণ। চম্পার অদর্শনে সমস্ত দিন আমার প্রাণটা কেমন অব্যক্ত যাতনায় দগ্ধ হইতেছিল। দ্বিতীয় তৃতীয় দিনও বালিকা দেখা দিল না। আমি এক একবার উদাস নয়নে জানালার দিকে চাহিলাম,—প্রত্যেক বারই চম্পার স্থান শূন্য দেখিলাম!

অপরাহ্ণে দুলা-ভাইকে দিদি চা খাওয়াইতেছিলেন। যখন চা ঢালিবেন ঠিক সেই সময় তাঁহার সাত মাসের খোকা পার্শ্বের ঘরে দাঙ্গা আরম্ভ করিল! দেখিতাম, দিদির উপর খোকার প্রভুত্বই অধিক! সুতরাং তিনি আমাকে চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া খোকার আদেশ পালন করিতে গেলেন।

দুলা-ভাই আমার প্রদত্ত চায়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তাহেরা! আজ তুমি আছ কোথায়?" আমি অপ্রতিভ হইলাম। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

দুলা-ভাই। চায়ে চিনি দেওয়া হয় নাই।

তাঁহার দিদি বলিলেন, "তাহেরা এ কয়দিন চম্পা-বিরহে অন্যমনস্কা আছে!"

দুলা-ভাই। কি জান, আপা! তাহেরার অন্যমনস্ক হওয়ার কারণ চম্পা-বিরহ, না, আজ ডাকে ব্যারিষ্টার সাহেবের পত্র না পাওয়া—তাহা ঠিক বুঝা যায় না!!

আমি অগত্যা সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলাম।

শেষে মন মানিল না, সন্ধ্যায় চম্পাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ও তাহার মাতা আসিল। চম্পাকে পশ্চাতে রাখিয়া তাহার মাতা আসিয়া একেবারে আমার পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল,—"চম্পা পিলা মনুষ্য—হু হু হু!" ব্যাপার দেখিয়া আমি ত অবাক; চম্পা ছেলে মানুষ, সেজন্য তাহার মাতা কাঁদে কেন? পরে বুঝিলাম, "হাকিম বাবু" স্বয়ং চম্পার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাই তাহাদের বিপদ ও ভয়ের কারণ! লোকগুলি যেমন ভীরু, তেমনই আবার যুক্তি তর্কেরও ধার ধারে না!

* * * * *

একবার আমি একটি ইংরাজবালাকেও ভাল বাসিয়া-

ছিলাম। তিনি শ্বেতাঙ্গী, আমি কৃষ্ণাঙ্গী—এক কথায় বলি, আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক,—তাঁহাদের বড়দিনের উৎসব সময়টা প্রায় আমাদের মধুর বসন্তের ন্যায়; আমরা বাসন্তী সন্ধ্যায় মুক্ত ছাদে বসিয়া সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত বেল যূথিকার পরিমলবাহী মলয়ানিল উপভোগ করিতে ভালবাসি, আর তাঁহারা পৌষমাসের দুরন্ত শীতে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে বসিয়া অনল উত্তাপ উপভোগ করিতে ভাল বাসেন! তবু আমাদের উভয়ের হৃদয়ে অকপট সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। মিস্ ডিও ইহা স্বীকার করিতেন।

মিস্ ডির বিরহে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম। তাঁহাকে শেষবিদায় দিবার জন্য আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। আমি ওয়েটিংরুমে বসিয়া গাড়ী ছাড়িবার বাঁশী শুনিলাম; গাড়ী চলিবার শব্দও শুনিলাম,—তখন মনে হইল যেন ট্রেণখানা আমার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল! তারপর? তারপর,—মিস ডি ও আমার মাঝখানে বিশাল সাগরের ব্যবধান রহিয়া গেল।

আবার বলি, এ কেমন প্রেম? আমার দীর্ঘজীবনের সমুদয় প্রেমকাহিনী বলিবার এ স্থান ও কাল নয়—তবে আর একটি মাত্র ঘটনা বলিয়াই উপসংহার করিতেছি।

আমি কয়েক বৎসর স্বামীসহ পশ্চিম প্রদেশে ছিলাম। অল্পকাল মধ্যেই প্রতিবেশিনী মহিলাবৃন্দের সহিত আমার আলাপ হইল। বিশেষতঃ একজন প্রবীণা মোসলেম ললনাকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করিতাম, তিনিও সুদে আসলে আমার ভালবাসা প্রত্যর্পণ করিতেন। তাঁহার সহিত এক ধর্ম্ম ব্যতীত অপর অনেক বিষয়ে আমার ঐক্য ছিল না। যথা তাঁহার জন্মভূমি পশ্চিমে, আমার জন্মভূমি পূর্ব্বে (অর্থাৎ বঙ্গদেশে); তিনি আমা অপেক্ষা বয়সে ত্রিশ বৎসরের বড় ছিলেন, তবু আমরা দুইটি শৈশবসঙ্গিনীর ন্যায় অভিন্নহৃদয় হইয়া উঠিলাম!

পরমেশ্বর মানবের অতি-প্রেম সহ্য করিতে পারেন না; সুতরাং আমার মাননীয়া বন্ধুটি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্তা হইলেন। আমি স্বেচ্ছায় তাঁহার অবৈতনিক সেবিকা হইলাম। এখন হইতে তাঁহাকে "আমার রোগী" বলিব।

জীবনে এই প্রথমবার (আত্মীয় ব্যতীত অপর) রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। পরের সেবায় এত সুখ-শান্তি, ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে,—তাই আমারও এ সুখশান্তিটুকু দেখিতে না দেখিতে—প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে না করিতে—ফুরাইয়া গেল।

আমি অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ-মুকুল, আতর, গোলাপজল প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধি, এবং বেদানা, কমলালেবু ইত্যাদি জড় বস্তুর আকৃতিতে আন্তরিক প্রেম উপহার লইয়া আমার রোগীর নিকট উপস্থিত হইতাম। কিসে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, কোন জিনিষটি তিনি ভাল বাসিবেন, এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতাম। তাঁহার মনোরঞ্জনই যেন আমার একমাত্র কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার রক্তহীন ক্ষীণ অধরে ঈষৎ হাস্য দেখিলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না।

আর আমার রোগীর মানসিক অবস্থা?—সন্ধ্যা হইলেই (আমি প্রত্যহ সায়াহ্নে এবং দিবা ১ ঘটিকার সময় তাঁহার নিকট যাইতাম) তিনি আমার জন্য তাঁহার শয্যার সন্নিকটে আসন প্রস্তুত করাইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা থাকিতেন। আমাকে দেখিবামাত্র যেন তাঁহার রোগযন্ত্রণা লাঘব হইত! যখন অত্যধিক দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হইয়া মুদ্রিত নয়নে পড়িয়া থাকিতেন, তখনও আমি আসিয়াছি শুনিলে চক্ষু খুলিতেন! সেই জ্যোতিহীন নয়নদ্বয় আনন্দ-কিরণে উজ্জ্বল হইত!

আমার রোগী আব্দার করিতেন—ঔষধ খাইবেন না। আমি ঔষধ হস্তে উপস্থিত হইলে তাঁহার শুষ্ক অধরে হাস্যরেখা প্রকটিত হইত—কপট বিরক্তির সহিত বলিতেন, "আয়ি মুঝে সাতানে কো" (আসিলেন আমায় জ্বালাতন করিতে!) কিন্তু ঔষধ তৎক্ষণাৎ সেবন করিতেন। যে পথ্য আর কেহ প্রস্তুত করিলে

অখাদ্য হইত, তাহা আমার করস্পর্শে সুস্বাদু হইয়া যাইত। প্রেমের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা !!

আমার রোগী সেই অন্তিম দশায়ও আমাকে দেখিলেই বসিতে অনুরোধ করিতেন; আমি নমস্কার করিলে তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। আমি তাঁহাকে যাতনা বেদনা ভুলাইয়া অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য ছোট ছোট গল্প বলিতাম, তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। তিনি অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়া ছিলেন, সেজন্য আমাকে উর্দ্দু গজল (গীতি-কাব্য) গাহিতে হইত। অধিকাংশ গজল তাঁহারই ফরমাইশ অনুসারে পঠিত হইত।

সেদিন আমার রোগীকে দেখিয়া হতাশ হইলাম। তাঁহার আরোগ্য লাভের শেষ আশাটুকু সেই দিন অন্তর্হিত হইল। আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম, অদ্য বসন্ত ঋতুর শেষ দিন; এই বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে আমার রোগীও শেষবিদায় লইতে চলিলেন! সেই রবি, শশী, তারা সবই থাকে, কেবল বসন্তমাধুরী ফুরায়! মানসকর্ণে কোন কবি ও প্রকৃতির প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিলাম,—

(প্রকৃতিরে) সুধাইনু, "কি হ'ল তোমার
সে সৌন্দর্য্য আর সেই (বসন্ত) যৌবন ?"
সহাস্যে উত্তর দিল সে, "ও প্রিয়তম !
আমি না ছিলাম, ছিল মহিমা স্রষ্টার" !

বসন্ত ত আবার আসিবে, আসিবেন না কেবল আমার রোগী!

ঠিক সেই সময় আমার রোগী অনুরোধ করিলেন,—

"গোর-চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হ'ল প্রায়—এই গজলটি গাও ত, তাহেরা !"

আমি বিস্মিত হইলাম; তিনি আমার মনোভাব বুঝিলেন কিরূপে? সে যাহা হউক, এখন রোগীকে কোথায় আশার কথা শুনাইব, না বৈরাগ্যব্যঞ্জক নিরাশার গান গাহিব, বলিব, "(কিছুকাল পরে তোমার) গোরের চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকিবে না?" আর যিনি আজি না হয় দু'দিন পরে নিশ্চয় মরিবেন, এরূপ রোগীর পার্শ্বে বসিয়া মৃত্যুগীতি গাওয়াও ত শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। আমি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম, ওটা খুব কণ্ঠস্থ নাই। তখন তিনি আমার হাতে একখানি গজলের খাতা দিয়া বলিলেন, "তবে—

নাই সেকেন্দর কিম্বা দারার কবর,—
মুছে গেছে মানীদের স্মৃতিচিহ্ন কত !

ইত্যাদি পড়।"

আমি বিপদে পড়িলাম, এটাও যে ঐ ধরণের কাব্য। শেষে রোগীর আব্‌দারই রক্ষা করা গেল! যদিও—

"মৃত্যুযন্ত্র কত জনে করেছে পেষণ,
হয়েছে ভূগর্ভে লীন যশস্বীরা কত ?"

আবৃত্তিকালে আমার হৃদয় দ্বিধা হইতেছিল! ভাবিয়াছিলাম এইভাবে আরও কিছুদিন কাটিবে। কিন্তু না—।

সেদিন বুধবার সন্ধ্যা। আমার রোগী অদ্য আমাকে চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন না; আমাকে বসিতেও বলিলেন না; আমি কাতরে ডাকিলাম, সাড়া দিলেন না। এই অনাদরে (?) আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। আমার চক্ষে জল দেখিলে তাঁহার কন্যা-বধূরা ধৈর্য্যহারা হইয়া গোল বাধাইবেন, এই ভয়ে অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলাম। ঐ সময় অশ্রু সম্বরণ কি কঠিন ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কে বুঝিবে?

আমি তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলাম, এমন সময় (আমার করস্পর্শে!) তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বহিন্! আজ বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছি।" সেই "বহিন্" শব্দটি কেমন প্রাণভরা ভালবাসার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা যে একবার শুনিয়াছে সে আর এ জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

বৃহস্পতিবার রাত্রি; আমার রোগীর হস্তপদ শীতল হইয়াছে। আমি সেই প্রাণহীন হাত দু'খানি গরম করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম,—আমার সম্মুখেই কি করিয়া তাঁহার প্রাণপাখী উড়িয়া গেল, দেখিতে পাইলাম না!

* * * * *

প্রেমের আলোচনা যতই করি, ততই দেখি, উহা দুর্ব্বোধ। প্রেমিক-হৃদয় নবনী সদৃশ কোমল; আবার পাষাণবৎ কঠিন। কখনও দেখি, প্রেম অতিশয় দৃঢ়, কখনও দেখি, ভঙ্গপ্রবণ। ইহা শিশুর হৃদয়ে থাকে, কিশোর-হৃদয়ে থাকে, প্রবীণ-হৃদয়েও থাকে—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়। প্রেম কি স্বর্গীয় কোন তরুর মত—আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ শাখা পল্লবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে? অথবা প্রেম কি কোন ভাষার মত—রাগরাগিনীর মত মানবের প্রাণে নানা ছন্দে ঝঙ্কারিত হয়? যাহা হউক, বুঝা গেল না, প্রেমের স্বরূপ কি। বুঝিলে এইমাত্র বুঝি, প্রেমের আদি অন্ত নাই—প্রেম-রহস্য দুর্ভেদ্য!

(Mrs.) R. S. Hossein.

চিল্কা।

পবিত্র গগনে পবিত্র তপনে
পবিত্র সাগরে ওঁ।
যাঁহার মহিমা নিত্য বিভাসিত
নমো বিশ্বেশ্বর ওঁ॥

একদিন সন্ধ্যাবেলা ভাগিনেয় শ্রীমান্—হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। এই দূর প্রবাসে হঠাৎ ভাগিনেয়কে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম, কিন্তু তখন কটকে অতি উৎকট ওলাউঠার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাই এই প্রিয়-সমাগম কেবল আনন্দ উৎপন্ন না করিয়া, ভয়ও আনয়ন করিল।

পরদিন সকালে ভুবনেশ্বর যাওয়া ঠিক হইল। আমরা কেহ যাইব না, বাবাজী তাঁহার সঙ্গীকে লইয়াই যাইবেন, ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই দিন কলেরার ভয়ে আমাদের স্কুল চারিদিনের জন্য বন্ধ হইল। সন্ধ্যাবেলা আমার অনুপস্থিতিতে বাবাজী মামিমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চিল্কা যাওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ, আমার সমস্ত যুক্তি তর্ক প্রবল স্রোতের সম্মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। স্থির হইল যে আগামী কল্য মান্দ্রাজ মেলে চিল্কা দেখিবার জন্য রম্ভা যাওয়া হইবে। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় উঠিয়া আয়োজন হইতে লাগিল। আহারাদি শেষ করিয়া দুখানা খোড়ার গাড়ীতে জিনিষ পত্র সহ আমরা সাত জন যাত্রা করিলাম। বহুদিন হইতে চিল্কা দেখিবার সাধ, আজ হঠাৎ অতর্কিত ভাবে তাহা পূর্ণ হইতে চলিল দেখিয়া সকলেরই মনে কত আনন্দ! দেখিতে দেখিতে ট্রেন হুস্ হুস্ করিয়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল, চারিদিকের রাস্তা ঘাট বৃক্ষ লতাদি সর্পাকারে আমাদিগকে বেষ্টন করিতে লাগিল, আমরা চারিপার্শ্বের এই চঞ্চল সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে চলিলাম। আমরা রম্ভা পৌঁছিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই চিল্কার সুনীল অচঞ্চল জলরাশি আমাদের নেত্রপথবর্ত্তী হইল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, চিল্কার সৌন্দর্য্য আমাদের মন প্রাণ হরণ করিতে লাগিল। রেল বর্ত্ম বহুদূর পর্য্যন্ত হ্রদের তীর দিয়া চলিয়াছে। গ্রীষ্মকালে চিল্কার জলরাশি রেল-পথ হইতে কথঞ্চিৎ সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু বর্ষাকালে জল লাইনের একেবারে উপরে আসিয়া পড়ায় ট্রেণ হইতে হ্রদদর্শনের সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। চিল্কা বঙ্গোপসাগরের অংশ, বালুকা-প্রাচীরে কিয়দংশ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হ্রদরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন নহে। হ্রদকে সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করিবার জন্য একটী সংকীর্ণ মোহানা আছে, এই মোহানা-পথে জোয়ারের সময় উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সমুদ্র-জল ভীষণ বেগে হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করে। তাই চিল্কার জল লবণাক্ত। ইহা জানা না থাকায়, হঠাৎ চিল্কার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে যাইয়া বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ষাকালে বিবিধ নদীর জল হ্রদে প্রবেশ করিয়া ইহার লবণস্বাদ দূরীভূত করিয়া দেয়। গ্রীষ্মকালে হ্রদের জল রক্ষার জন্য চারিদিকে পাহারা বসে। লবণসমুদ্রে বেষ্টিত থাকিয়া নুন কিনিয়াই খাইতে হইবে, এ নিষ্ঠুর নিয়ম সুশাসিত

ভারত ছাড়া আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এক কলসী জল তুলিলেই পুলিস ঠ্যাঙ্গা লইয়া তাড়া করে। চিল্কার পরিমাণ প্রায় ৪৫০ মাইল কিন্তু গ্রীষ্মকালে ১০০ মাইল আন্দাজ কমিয়া যায়। চিল্কার আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ। উত্তর দিকে ইহার বিস্তার প্রায় ৪০ মাইল, কিন্তু দক্ষিণ দিকে মাত্র ৬ মাইল। চিল্কা গভীর হ্রদ নহে। দুই চারিটি গর্ত্ত ছাড়িয়া দিলে কোথায়ও চারি হস্তের বেশী গভীর হইবে না। সুতরাং ধীবরেরা অতি সহজেই হ্রদে যাতায়াত করে। চিল্কার চারিদিক মৎস্য ধরিবার জাল ও দেয়ালে পরিবেষ্টিত হওয়াতে হ্রদের বিচিত্রতা অনেকটা বর্দ্ধিত হইয়াছে। চিল্কা উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের সীমানায় অবস্থিত। ইহার অর্দ্ধেক গঞ্জামে ও অর্দ্ধেক উৎকলে। উচ্চ-নীচ-শ্বেত-কৃষ্ণ-পর্ব্বত-মালা-পরিখচিত, সুশ্যামল-বৃক্ষলতা-তৃণ-গুল্ম-পরিপূর্ণ-দ্বীপাবলি পরিশোভিত, ক্রীড়মান হংস চক্রবাক্ প্রভৃতি উভচর পক্ষীকুলের কলকণ্ঠমুখরিত এবং মৎস্য-মকর-শিশুমার প্রভৃতি জলচর জন্তুগণের সঞ্চরণোদ্ভাসিত চিল্কার দিগন্তপ্রসারিত বারি রাশি যে ভুবনমনো-মোহিনী ভারত-মাতার সৌন্দর্য্যদেহের এক বিশেষ অঙ্গ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উৎকল কবিগণ ইহাকে শোকহরা অপ্সরা-কানন ও প্রকৃতির চারু চিত্রশালা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা অনিমেষ নয়নে প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা দর্শন করিতে করিতে ১১টার সময় রম্ভা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে সহর কিছু দূরে, মুটিয়ার মাথায় জিনিষ পত্র তুলিয়া দিয়া আমরা পদব্রজেই সহরে প্রবেশ করত বন্ধুবর "প্রজাবন্ধু"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তিনি স্বীয় গৃহের এক অংশ আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন এবং অতিথি সৎকারের সর্ব্ববিধ আয়োজনের কিছুই ত্রুটি করিলেন না। আমরাও সংকুচিত হইতে কিছুই বাকি রাখিলাম না। আর এরূপ স্থলে ত্রুটী করিবার কোনও কারণই ছিল না। আমরা আহারাদি শেষ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ৪টার সময় নৌকাযোগে চিল্কা দর্শনে বাহির হইলাম। আমাদের সঙ্গে চলিলেন গঞ্জামের ব্রাহ্মবন্ধু বাবু শশিভূষণ রথ। ইনি বড়-খেমিদির রাজসরকারে চাকুরী করিতেন, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণরূপ মহা অপরাধের জন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শশী বাবু চর্ম্ম প্রস্তুতকরণ বিদ্যা শিক্ষার অভিলাষে বিলাত যাইবার জন্য এখন প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা আট জন হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম কয়েকজন লোক শূন্য কলসী লইয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে ফিরিতেছে। আমাদিগকে পাদুকা খুলিতে হইল, অল্পজলে বহুদূর হাঁটিয়া নৌকায় চড়িলাম। চারিজন মাঝি কেবল মাত্র বংশদণ্ডপরিচালিত নৌকা খানা লইয়া চলিল। অকস্মাৎ আমাদিগকে হ্রদ আক্রমণ করিতে দেখিয়া হ্রদজলে ভাসমান এক ঝাঁক পাখী কলরব করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া হ্রদের শোভা বৃদ্ধি করিয়া দিল। আমরা দূরবর্ত্তী একটী মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। এই খানে পর্ব্বত সন্নিকটে দৃষ্টিভ্রান্তির একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। তীর হইতে যখন দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম তখন মনে হইয়াছিল যে মন্দিরটি দক্ষিণস্থ একটী পাহাড় হইতে বহু দূরে। কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, মন্দির নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল কিন্তু পাহাড় দূরে সরিয়া চলিল। মন্দিরে পৌঁছিয়া দেখি যে উহা পাহাড়ের অতি নিকটে। কিছু পূর্ব্বে একটি ধবল পাহাড়কে পূর্ব্বোক্ত পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখি যে তাহা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে; কত দূরে, পাহাড়ের দূরত্ব সম্বন্ধে এক বার ভ্রমে পতিত হইয়া আর অনুমান করিতে সাহস হইল না। শুনিলাম হ্রদমধ্যবর্ত্তী এই মন্দিরটি ফরাসীদিগ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। উহা যে কেবল হ্রদের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে তাহা নহে, উহার আরও একটী অভিপ্রায় আছে বলিয়া মনে হইল। মন্দিরটি একটী নিমজ্জিত শিলা খণ্ডের উপর স্থাপিত, এখন যদিও নিমজ্জিত নহে, কিন্তু বর্ষাকালে নিশ্চয়ই নিমজ্জিত হয়, সুতরাং যাহাতে তাহার সংস্পর্শে আসিয়া নৌকা চূর্ণ বিচূর্ণ না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই হয় তো কেহ

এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। মন্দিরটি অতি ক্ষুদ্র, পার্শ্বে একটী ক্রম-সূক্ষ্ম স্তম্ভ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম বর্ষাকালে মন্দিরটীর অধিকাংশই জলমগ্ন হয় কিন্তু ভীষণ বর্ষায় যদি মন্দির একেবারেই ডুবিয়া যায় তবুও স্তম্ভটি চিহ্ন স্বরূপ বিদ্যমান থাকিবে, বোধ হয় ইহাই স্তম্ভটির সার্থকতা। স্থানটি অতি মনোরম, পার্শ্বদেশে কৃষ্ণবর্ণ পাহাড় মস্তকোত্তোলন করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান, সম্মুখে শ্বেত পর্ব্বত ধূ ধূ করিতেছে, চারিদিকে প্রশান্ত নীল জল অনন্তবিস্তারিত। প্রকৃতির এই বিরাট গম্ভীর সত্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন স্বতঃই বিশ্বস্রষ্টার চরণে অবনত হইয়া পড়িল, গৃহিণী গান ধরিলেন,—

কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়,
সীমা অন্ত রেখা, নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিশায়।

সকলেই ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। সময়োচিত একটী প্রার্থনার পর ধীরে ধীরে সকলে গাত্রোত্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলেই নীরব, নিস্তব্ধ, কিছুক্ষণ কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"চিন্তার প্রবাহ
অনন্তের মহা গর্ভে প্রবেশে যখন,
ভাষা তার নীরবতা! নীরবতা ভাষা,
পতঙ্গ সাগর-গর্ভে পতিত যখন।"

ক্ষণকালের জন্য মানব জীবনের ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব যুগপৎ মানসনেত্রের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। আমরা সকলে নৌকারোহণ করিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। পাহাড়টির নাম "ঘণ্টা-বাজা"। শুনিলাম যে উহার প্রস্তরে আঘাত করিলে ঘণ্টার শব্দ হয়। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম নামটি নিতান্ত নিরর্থক নহে। পাহাড়ের পাদদেশ জঙ্গলাকীর্ণ, মধ্যে মধ্যে ভীষণ কণ্টক বন। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁশের ঝোপ। আমাদের বড়ই সাধ হইল যে দুই এক খানা বাঁশ কাটিয়া লই, কিন্তু অস্ত্রাভাবে বাসনা পূর্ণ হইল না। আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পর্ব্বতারোহণে অগ্রসর হইলাম। চারিজন দ্রুতপদক্ষেপে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। অর্দ্ধাঙ্গভার-প্রপীড়িত আমি তাঁহাদিগের সঙ্গ লইতে পারিলাম না। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" এই মহাসত্যের সবটাই তখন হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলাম না। গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গল ঠেলিয়া ঊর্দ্ধ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কতক গায়ের জোরে, কতক আমার সাহায্যে তিনি ছ আনা আন্দাজ উঠিলেন, তার পর পপাত—সেই খানে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার স্বর্গারোহণ ঐ খানেই থামিল, আমারও বাধা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু কোন্ পাপে? নারীজাতি সম্বন্ধে পুরুষের পক্ষে এ প্রশ্নে মাইকেলের রাবণের "কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি, হরিলি এ ধন তুই?"—এই আক্ষেপোক্তিই স্মরণ হয়! যাহারা সমাজের অর্দ্ধাঙ্গকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের পক্ষে রমণী সঙ্গিনী হইতে পারিল না বলিয়া আক্ষেপ করিবার কোনও অধিকার নাই। এখনও কত যুগ ধরিয়া বিগত পাপের অনুশোচনা করিতে হইবে, তাহা কে জানে। যাহা হউক, আমি শাস্ত্র-বাক্য অনুসারে গৃহিণীকে পথে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলাম। শশী বাবু ও ভ্রাতা ডলু বাবুও সেই খানেই থামিলেন। অগ্রগামী চারি-জনের মধ্যে একজন পশ্চাৎ ফিরিয়া আমাদের সঞ্চরণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি সুতরাং যূথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। দলভ্রষ্ট আমরা দুই জন একত্রিত হইলাম। এখন হইতেই আমাদের প্রকৃত পক্ষে পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ হইল, জঙ্গল কাটিয়া গিয়া কেবল মাত্র পাষাণে আসিয়া পড়িলাম। তিন পাথর উঠি তো দুই পাথর নামিয়া যাইতে হয়। এইরূপে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তিন চতুর্থাংশ উঠিলাম, এখনও এক চতুর্থাংশ বাকি। কিন্তু ইহার মধ্যেই সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বন করিলেন। মনে মনে সূর্য্যের উপর বড়ই রাগ হইল। পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিতে না পারিয়া মনে একটা দারুণ ক্ষোভ রহিয়া গেল। অগ্রগামী তিন জন এতক্ষণ পর্ব্বত-শিরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ডাকিলাম, অনেক ডাকাডাকির পর তাঁহারা উত্তর দিলেন। তাঁহারা পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম না করিয়া নামিতে

পারিবেন না। আমরা এখন উঠিলে আমাদেরও বিশ্রামের প্রয়োজন হইবে, এদিকে সন্ধ্যা হইয়াছে, সুতরাং আর উঠিবার চেষ্টা না করিয়া উপরিস্থ সঙ্গীগণকে আশ্বাস দিয়া আমরা দুইজন অবরোহণ আরম্ভ করিলাম। অবরোহণ কিয়ৎপরিমাণে সহজসাধ্য কিন্তু অধিকতর বিপদসঙ্কুল। আমরাও ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলাম। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, আবার ডাকিলাম, কি নীচ কি উপর কোথা হইতেই উত্তর পাইলাম না। আমাদের নৌকাখানি অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল, তাহাতে মানুষ আছে কি না বুঝা গেল না। আরও খানিক দূর অবতরণ করিয়া বুঝিলাম, যে গৃহিণীরা আমাদের অপেক্ষা না করিয়াই নীচে নামিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উপরওয়ালাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তখন অন্ধকার হইয়াছে, খুব চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিলাম, অনেক কষ্টে সাড়া পাইলাম। বুঝিলাম তাহারা অনেক দূর নামিয়া আসিয়াছেন। আমি সেই স্থানে দাঁড়াইলাম, সঙ্গী নীচে নামিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা পথ হারাইয়াছেন, তাই আমি নৌকা হইতে লণ্ঠন আনাইয়া আলোহস্তে দাঁড়াইলাম। কিন্তু সব বৃথা। তাঁহারা পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে যাইয়া পড়িয়াছেন। তখন আমি আলো হস্তে নামিয়া পড়িলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বুঝিলাম যে তাঁহারাও পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আমরা নৌকা লইয়া তাঁহাদের নিকট গেলাম। তাঁহারা বলিলেন, যে বাঘের গন্ধ পাইয়া দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহারা ছুটিয়া আসিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের রাস্তা ভুলিবার প্রধান কারণ। আসিবার সময় মৃত জন্তুর অস্থি কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। আসিবার সময় শরীর স্থানে স্থানে কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখন তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর হয় নাই। হ্রদজলে হস্ত পদ ধৌত করিতে যাইয়া নূতন বিপদ—কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা। যাহা যউক, আমরা অনেক অভিজ্ঞতা লইয়া এবং তৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় হ্রদোপরি সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। গৃহে ফিরিয়া দেখি, বিদ্যারত্ন মহাশয় অতিথি সৎকারের বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। আহার করিয়া শয়ন করিতে আমাদের রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল। তারপর আরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে চিল্কা, মন্দির, পাহাড় সকলই লুক্কায়িত হইল।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর সকলে মিলিয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম। রম্ভা গঞ্জাম জেলার একটী গ্রাম মাত্র। চিল্কা ও খল্লী-কোটের রাজার প্রাসাদ ছাড়া দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। এক সময়ে রম্ভা ব্যবসায়ের একটী কেন্দ্র ছিল, রেল হওয়াতে কেন্দ্রত্ব দূর হইয়াছে, এখন চিল্কা-দর্শনার্থীর পরিধি মাত্র। গঞ্জামের অধিকাংশ এক সময়ে উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল, উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ গঞ্জামবাসী ছিলেন। গঞ্জামের লোকসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ উড়িয়া, এক তৃতীয়াংশ তেলেগু। সিকাকোল বাদ দিলে চৌদ্দ আনাই উড়িয়া। কিন্তু গঞ্জামে উড়িয়াদের অপেক্ষা তেলেগুরা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, তাহাদের প্রভাব অনেক বেশী। উৎকলবাসীগণ গঞ্জাম উড়িষ্যায় আনিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। ভেদ (divide and rule) যে গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতি, তাহার কাছে, এ আশা পূর্ণ না হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা রাস্তায় বাহির হইলাম, চারিদিক হইতে তেলেগু রমণীগণ দরজা জানালা খুলিয়া অতি সোৎসুকনয়নে আমাদিগকে দেখিতে লাগিল, যেন কোনও অদ্ভুত জানোয়ার পথ দিয়া যাইতেছে। তেলেগু দিগের মধ্যে পর্দ্দার আঁটাআঁটি নাই। আমরা বড় রাস্তা ধরিয়া বৃক্ষাচ্ছাদিত মাঠের পথে আসিয়া পড়িলাম। খানিক দূর গিয়া রাজবাটী দেখিবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমরা প্রথম "মর্দ্দরাজ প্রেস" দেখিলাম। এই প্রেসেই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "প্রজাবন্ধু" ছাপা হয়। রাজার উপাধি অনুসারে প্রেসের নাম মর্দ্দরাজ হইয়াছে। আমরা কিছুক্ষণ মেসিন প্রেসের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। তৎপর রাজবাটীতে প্রবেশ করিলাম। প্রথম টেলিফোঁ ঘর। ১২ মাইল দূরবর্ত্তী রাজধানী খল্লীকোটের

সঙ্গে তার সংযুক্ত, আমাদের সঙ্গে খল্লীকোটের কিঞ্চিৎ বাৎচিৎ হইল, তার পর রাজবাটীর ভূতপূর্ব্ব এবং প্রেসের বর্ত্তমান ম্যানেজার বাবু জয়কৃষ্ণ চৌপট্টনায়ক তন্ন তন্ন করিয়া আমাদিগকে রাজবাটীর নীচতলা দেখাইলেন। জবাটী সম্পূর্ণ সাহেবী কায়দায় সজ্জিত। বিদ্যুতালোকিত বিলিয়ার্ড ঘর, সাওয়ার বাথ্, হট্ বাথ্, কোল্ড্ বাথ্, ড্রেসিং-রুম, বাথ্-রুম সকলই দর্শনযোগ্য। সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় রাজার পঞ্চমবর্ষীয় শিশু পুত্র। রাজ পুত্রের এখনও ইংরাজী বর্ণপরিচয় হয় নাই, কিন্তু আমাদিগকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া করমর্দ্দন করতঃ ইংরাজীতে—When did you come? Where do you live? How do you like the place? How long will you stay here?—প্রভৃতি প্রশ্ন করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিলেন, আমরা যথাযথ উত্তর দিলে তিনি চিড়িয়াখানা দেখিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়া নিজেই অগ্রবর্ত্তী হইলেন, আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। চিড়িয়াখানার সবে পত্তন হইয়াছে, তবে রাজার যেরূপ শিক্ষা ও রুচি তাহাতে উহা শীঘ্রই যে একটী দর্শনযোগ্য ব্যাপারে পরিণত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা রাজপুত্রের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলাম। আমরা রাজবাটী দর্শন করিয়া বেশ বুঝিলাম, যে রাজা বস্তু-সংগ্রহে ও স্থান নির্ব্বাচনে স্বীয় সৌন্দর্য্যবোধের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্থানটি অতি সুন্দর। ঠিক চিল্কার উপরে। যখন সন্ধ্যাবেলা বিদ্যুতালোক সকল জ্বলিয়া উঠে, তখন চিল্কারও শোভা বৃদ্ধি পায়। একটি অপ্রশস্ত বাঁধান রাস্তা গেট হইতে হ্রদ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। দুইখানি ষ্টিম বোট দেখিলাম—হ্রদে একখানি ও ডকে একখানি। হ্রদের জলে কল খারাপ হইবে বলিয়া এক জলের পাইপ হ্রদের নীচ দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত যাইয়া কলে জল যোগায়। রাজবাটীর সর্ব্বত্রই পাইপের জলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। রাজার ইঞ্জিনিয়ার একজন বাঙ্গালী বাবু। তিনি রাজবাটীর দোতালা দেখাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু একটু খট্‌কা উপস্থিত হইল। রাজা উপস্থিত নাই, রাণী রহিয়াছেন। যদিও মহল স্বতন্ত্র, তবুও রাণী-মহলের এত নিকটবর্ত্তী একজন ভদ্র মহিলার পক্ষে রাণীর সঙ্গে দেখা না করাটা যুক্তি সঙ্গত নয়, আর রাজার অনুমতি ছাড়া দেখা করাটাই বা কেমন হয়। কিন্তু মীমাংসায় উপনীত হইতে বেশী দেরী হইল না। তখন উদরদেব যথেষ্ট উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন, গৃহ গমনই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। ইঞ্জিনিয়ার বাবু অনুরোধ করিলেন আজ থাকিলে রাজার বোটে চিল্কার বহুদূর পর্য্যন্ত করা যাইবে, কিন্তু আমরা তাঁহার এই অনুরোধ করিতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। ফিরিয়া আমাদের কেহ কেহ চিল্কা হইতে স্নান করি আসিলেন। স্নানাহারের পর আমাদের জন্য বৃহৎ বলীবর্দ্দ-বাহিত এক শকট হাজির হইল। বিদ্যারত্ন মহাশয় ও শশী বাবুর নিকট বিদায় লইয়া আমরা সাত জন শকটারোহণ করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে গমন করিলাম। হুস্ হুস্ করিয়া গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, আমরা গাড়ীতে চড়িলাম, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা যায় চিল্কার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ—আমাদের পাঠকপাঠিকা সংবাদ পত্রে পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের সংবাদ অবগত হইয়াছেন। দারুণ অন্নকষ্টে লোকের দুর্দ্দশার আর সীমা নাই প্রাণনাশেরও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ফুলার সাহেবের মত প্রজার প্রতি সহানুভূতিশূন্য শাসনকর্ত্তার নিকট এই সময় যথোচিত সাহায্য প্রাপ্তির আশা বিড়ম্বনা। সহৃদয় নরনারী যে সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন, তাহা প্রয়োজনের পক্ষে অতি সামান্য। আমাদের পাঠকপাঠিকাগণের নিকট নিবেদন এই, যে তাঁহারা এই সময়ে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদের বিপন্ন দেশবাসীগণের জীবন রক্ষা করুন। বরিশালে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত,

...র শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার ও ময়মনসিংহে ...ক্ত অনাথবন্ধু গুহ, দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটীর সম্পাদক, ...ই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইতে হইবে।

রাজকুমারী এনা—আমাদের রাজ-ভাগিনেয়ী রাজকুমারী এনার সহিত সম্প্রতি স্পেনরাজ আলফন্সোর

রাজা আলফান্সো ও রাজকুমারী এনা।

বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহ উপলক্ষে একটী অতি শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। ইউরোপে এনার্কিষ্ট নামে এক গুপ্ত সম্প্রদায়ের লোক পৃথিবীর রাজকুলকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বিবাহের পর রাজদম্পতি যখন রাজপ্রাসাদে ফিরিতেছিলেন, তখন এই সম্প্রদায়-ভুক্ত কোন লোক পুষ্প স্তবকের মধ্যে একটী বম্ লুক্কায়িত রাখিয়া রাজদম্পতির প্রতি তাহা নিক্ষেপ করে। সৌভাগ্য-ক্রমে বম্ তাঁহাদের গায়ে না পড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তীদিগের মধ্যে পতিত হয়। তাহাতে ৮।৯টী লোক হতাহত হইয়াছে, নববধূর বিবাহ-বেশ পর্য্যন্ত রক্তাপ্লুত হইয়াছে, কিন্তু নব দম্পতির কোন অনিষ্ট হয় নাই। ঘটনার কয়েকদিন পরে বম্-নিক্ষেপকারী ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দুর্বৃত্ত এনার্কিষ্টগণ রাজকুলের মহা ভীতির স্থল হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার দেশপতি এব্রাহাম লিঙ্কন, গারফিল্ড, কারনট ও ম্যাক্‌কিন্‌লি, রুশরাজ আলেকজ্যাণ্ডার, অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী, ইটালীর রাজা প্রভৃতি অনেকেই এই গুপ্ত হত্যাকারী পাপাত্মাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

লেডি কার্জ্জনের মৃত্যু—আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাটপত্নী লেডি কার্জ্জন গত ১৯শে জুলাই পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি বুদ্ধিমতী, অপূর্ব্ব সুন্দরী ও পরম পতিপরায়ণা নারী ছিলেন। রাজকার্য্যে সর্ব্বদা স্বামীকে সাহায্য করিতেন। এদেশে ইনি সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

২৬৮

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।